রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্দ্দশ ভাগ। ২য় সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, পত্রিকাধ্যক্ষ;

রঙ্গপুর

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার [illegible]
সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী।

ভ্রম-সংশোধন।

৫৬ স্থলে ৬৫ পৃষ্ঠাঙ্ক মুদ্রিত হওয়ায় শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পত্রাঙ্ক ৫৭ হইতে ৭২ হইবে।

রঙ্গপুর লোকরঞ্জন প্রেস।
হইতে
[illegible]নাথ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩২৬

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
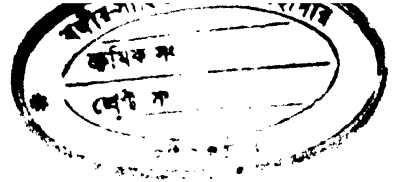
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর।

বাত্যাতাড়িত বিরাট বিটপীর অকস্মাৎ পতনে ধরণীতল যেরূপ বিচলিত হইয়া থাকে, জ্ঞান মহামহীরুহকল্প কবিসম্রাট পণ্ডিতরাজের অচিন্তিতপূর্ব্ব মহাপ্রয়াণে সুধী সমাজে তাদৃশ বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ বিক্ষুব্ধ হইবার কারণ পরম্পরার অভাব নাই। আদি বৈদিক যুগের জ্ঞানাকাশের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাজি ঋষিকুলের দূর স্মৃতিবাহী যে সকল ক্ষুদ্র তারকা আজও ব্রাহ্মণপণ্ডিত অভিধানে ভারতললাটে অতি ক্ষীণ দীন আভা বিস্তার করিতেছিল, কালের আবর্ত্তনে তাহারাও একে একে স্খলিত হইতেছে, এবং তাহার ফলে প্রাচ্যভূমি ঘোর তমসাবৃত নিজস্ববর্জ্জিত সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য পরমুখোপাসক হইয়া পড়িতেছে। জটাজুটধারী চীরপরিহিত বনচারী ফলমূলাহারী, সদাধ্যানরত, নির্ভীক, নির্লোভী, স্বল্পতুষ্ট, সারল্যের আধার তাপসদিগের পূত আদর্শ, অনাড়ম্বর অধীতশাস্ত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সম্যক্ না হউক, অংশতঃ আজও বহন করিতেছেন। প্রাচ্যসমাজদেহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার শীর্ষাঙ্গ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সমাজ রক্ষার জন্য এখনও যে বজ্রমুষ্টি ধারণ করিয়া আছেন, তাহার ফলে এই প্রাচীন সমাজ এখনও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় নাই, এবং প্রাচ্য সভ্যতার আদর্শ এখনও অতল জলধিজলে প্রতীচ্যের বহির্ম্মুখ সভ্যতার সঙ্গে একেবারে মিশাইয়া গিয়া আত্মসত্ত্বা হারাইয়া ফেলে নাই। ভারতের সেই প্রাগাদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে স্বাধীন প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং যাহা একমাত্র ঐহিক মুক্তির উপায় বলিয়া একশ্রেণীর সুধীমণ্ডলী এতকাল পরে নির্ণয় করিয়াছেন, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর অনাসক্ত স্বাবলম্বীর ও স্বাধীন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সেই জলন্ত দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে এখনও বিরল নহে। তাপস যুগের নিরাবিল জ্ঞানপিপাসু নিস্বার্থক কর্ম্মত্যাগী সারল্যের আধার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের বলক্ষয় হইলে এই কারণেই সমগ্র সমাজের অশেষ অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সহসা তিরোধানে দেশ ও সমাজের যে ঘোর অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; জানিনা তাঁহার স্থান অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে কি না?

জন্ম স্থান।

এই কবিকল্প মহাপুরুষ উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর জেলার অতি ক্ষুদ্র পল্লী ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পল্লীটি ক্ষুদ্র হইলেও অগাধ পণ্ডিত অনাড়ম্বর নামাবলীধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্ম

জ্ঞানালোচনার একটি কেন্দ্র,—বঙ্গের দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। প্রাচীন তাপসদিগের অধ্যুষিত তপোবনের ন্যায় অধীতশাস্ত্র অধ্যাপকমণ্ডলী ও বিদ্যার্থিগণের পূতচরণস্পর্শে এই পল্লীভবন একদা পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। অধিক দিনের কথা নহে—মিষ্টার এডামস্ যখন বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থাদির বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তখনও পল্লীতে বহু অধ্যাপক এবং দেশ ও বিদেশাগত বহু ছাত্র অধ্যাপন ও অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিল। ইটাকুমারীর অধ্যাপকাগ্রগণ্য পণ্ডিতকুলচূড়ামণি রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কারের নাম তৎকালে বঙ্গবিশ্রুত হইয়াছিল।

শিক্ষা।

এরূপ পুণ্যক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ উদিতাকুলে রুদ্রমঙ্গলের উপযুক্ত বংশধর যাদবেশ্বর বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্ত শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ও অভিভাবক শূন্য হওয়ায় স্বগ্রামে ইঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া অনুগত হিতৈষী আঢ্য পিতৃশিষ্যগণ তাঁহাকে কৈশোরের প্রারম্ভেই শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বারাণসীধামে উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকটে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি ষড়দর্শনবেত্তা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী সুপ্রসিদ্ধ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং তাপসকল্প পরমযোগী স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকটে বেদান্ত ও যোগদর্শন পাঠ করেন। শিরোমণি মহাশয় ইঁহাকে পাঠ সমাপনান্তে "তর্করত্ন" উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। তৎকালে গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কাজেই উপাধিলাভ সুলভ ও সহজসাধ্য ছিল না। পঠদ্দশাতেই ইঁহার অসাধারণ মেধা সূচাগ্রতীক্ষ্ণবুদ্ধি কবিত্ব প্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বারাণসী ধামের কুইনস্ কলেজের প্রসিদ্ধ প্রধানাধ্যাপক মিষ্টার গ্রিফিথস্ আগ্রহ সহকারে ইঁহাকে কিছুদিন পাশ্চাত্য দর্শনাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণার্থ স্বীয় কলেজে সাদরে আহ্বান করেন। তৎকলে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ডাক্তার ভিনিসও উক্ত কলেজে পাঠ করিতেন।

আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ও পণ্ডিতবর তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়দ্বয়ের মধ্যে সরস্বতী মহাশয়ের অভিনব সনাতনধর্ম্ম মত লইয়া যে প্রসিদ্ধ বিচারবিতর্ক হইয়াছিল, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া তর্করত্ন মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন।

বারাণসীধাম হইতে পাঠ সমাপনান্তে তিনি রঙ্গপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রথমে তাঁহাকে স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় এবং তৎপরে রঙ্গপুর কলেজের অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই রঙ্গপুরে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রধানতঃ ভূম্যধিকারীদিগের চেষ্টায় যে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই পরবর্ত্তী কালে কলেজে পরিণত হয়। কিন্তু স্থানীয় অস্বাস্থ্যতা ও গমনাগমনের অসুবিধাহেতু বিদেশ হইতে তাদৃশ ছাত্র সমাগম না হওয়ায় এবং স্থানীয় লোকের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তৎকালে আগ্রহের অভাবে ঐ কলেজের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমানে দেশের সম্পূর্ণ অবস্থান্তর ঘটায় এবং রঙ্গপুরের স্বাস্থ্য বঙ্গের মধ্যে অন্যান্য জেলার তুলনায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করায় এবং লৌহবর্ত্মে তাহার আপাদমস্তক বেষ্টিত হওয়ায় রঙ্গপুরে এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর "কারমাইকেল" অভিধেয় এক বিশাল বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম কর্ম্মী এবং কলেজ কমিটির আজীবন সদস্য ছিলেন। যাহা হউক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনাস্থা থাকিলেও সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা ও পঠন পাঠনে এই বঙ্গোত্তর প্রদেশ তখন কোনও অংশে পশ্চাৎপদ ছিল না। রঙ্গপুর কুণ্ডী হইতে তৎকালে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া সংবাদ-প্রভাকর ও ভাস্করাদির প্রতিধ্বনিতে উত্তরবঙ্গ মুখরিত করিতেছিল। স্বনামখ্যাত প্রভাকরের প্রভাস্বরূপ গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র বার্ত্তাবহ পরিচালক কবি কালীচন্দ্রের গুণমুগ্ধ হইয়া মাসাধিককালের দুর্গম পথক্লেশ তুচ্ছ করিয়া নৌকাপথে কুণ্ডী নগরে শুভাগমন পূর্ব্বক কালীচন্দ্রের সহিত কাব্যালাপে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন। কবি কালীচন্দ্রের কাব্য প্রতিভা আজও জীর্ণ বার্ত্তাবহ পত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইঁহারই উৎসাহ প্রণোদিত হইয়া বাঙ্গলার কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় "পদ্মিনী উপাখ্যান" রচনা ও বাঙ্গলার আদি নাট্যকার রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক প্রণয়ন করেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি বাঙ্গলার মধুচক্র নির্ম্মাণের উত্তেজনা ইঁহারই নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবি কালীচন্দ্রের তিরোধানের পরে রঙ্গপুর কাকিনাধিপতি শম্ভুচন্দ্র তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হন। তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে তাঁহার রাজধানীতে নবরত্নের সমাবেশ করিয়াছিলেন। এই নবরত্নের অন্যতম স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কাব্য প্রতিভা ভারতবিদিত "হেমোদাহকাব্যম্" "বিজয়িনীকাব্যম্" প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যভাণ্ডার চিরপুষ্ট করিয়া রাখিবে। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর এই ঈশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়েরই উপযুক্ত ভ্রাতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ ডাক্তার স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার Linguistic Survey of India" গ্রন্থের বঙ্গোত্তরদেশীয় ভাষাতত্ত্ব সংগ্রহে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নবরত্নের অন্যতম তারাশঙ্কর মৈত্রেয় মহাশয়ের রচিত দুর্গোৎসবতত্ত্ব নামক গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। তারাশঙ্করের সুযোগ্য বংশধর হরশঙ্কর মৈত্রেয় "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রিকা" পরবর্ত্তীকালে "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" নাম ধারণ পূর্ব্বক শম্ভুচন্দ্রের ব্যয়ে কাকিনা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলে তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই "দিক্‌প্রকাশ" ও রাজসাহী হইতে প্রকাশিত "হিন্দুরঞ্জিকা" পত্রিকায় পণ্ডিতরাজের তৎকালীন ভাবের পরিচায়ক বহু সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম রঙ্গপুর কলেজের পরমায়ু শেষ হইলে অনেক স্থান হইতে নিয়মিত বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন। পরিশেষে সংস্কৃত কলেজের প্রধানাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের

রচিত প্রবেশিকা গ্রন্থের সমালোচনা করায় চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকতা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু উদীচ্য ভট্টাচার্য্যের উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং অধ্যাপকের প্রাচীন আদর্শের মধ্যে লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যাদবেশ্বরের স্বাধীনতাবিবর্জ্জিত বৃত্তি অবলম্বনে প্রথমাবধিই আন্তরিক অনিচ্ছা ছিল। তিনি স্বাধীনভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক জন্মভূমি রঙ্গপুরেই শাস্ত্রালোচনার একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অধিক আগ্রহান্বিত হইলেন। ইহার ফলেই তিনি চিরকাল নিজ স্বাধীনতা রক্ষার সোপান প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শাস্ত্রবৃত্তি যে মতস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ অপ্রতিকূল তাহা সুধীমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। রঙ্গপুরের তাৎকালিক বিদ্যোৎসাহী বহু ভূম্যধিকারী ও রাজপুরুষদিগের দানশৌণ্ডতা ও সহানুভূতিতে তাঁহার এই সাধুসঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছিল। সুনিপুণ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রদর্শী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের পূজনীয় পিতৃদেব কৃষ্ণধন ঘোষ (কে, ডি ঘোষ) মহাশয় তৎকালে জেলার সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। ঘোষ মহাশয় রঙ্গপুরের অশেষ হিতকর কার্য্যের সহিত যুক্ত ছিলেন বলিয়া জনসাধারণ ও ভূস্বামী সম্প্রদায় তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন। তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কে, ডি ক্যানাল নামক যে জল-প্রণালী রঙ্গপুর নগরের মধ্য দিয়া খনন করাইয়াছিলেন, তদ্দারা উক্ত নগরের যথেষ্ট স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে। স্থানীয় উন্নতি সাধনে সেকালের রাজপুরুষগণের আগ্রহ যথেষ্ট ছিল। অধুনা সে প্রবৃত্তির অবসান হইয়াছে, অথবা কর্ম্মভারাক্রান্ত হইয়া তাঁহারা একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় শাস্ত্রালোচনা করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। রঙ্গপুর জেলার মফঃস্বলে স্থানে স্থানে ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারা পুষ্ট চতুষ্পাঠীর তৎকালে অসদ্ভাব ছিল না, কিন্তু রঙ্গপুর নগরে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার জন্য ইতঃপূর্ব্বে আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। নাগরিকগণ অধিকাংশই পাশ্চাত্য ভাষার পক্ষপাতী। দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের অনুরক্ত হইবার কোন কারণ ছিল না। প্রতি নগরে পাশ্চাত্য শিক্ষালয়ের অভাব এখন নাই, কিন্তু ভারতের ভাবী মঙ্গলের নিদান প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা ও ব্রহ্মচর্য্যের মূলীভূত বিদ্যাপীঠ বিরল হইতে বিরলতর হইতেছে, ইহা অনুধাবনযোগ্য কি না সুধীসমাজ তাহার বিচার করিবেন। উপযুক্ত পাত্রের তত্ত্বাবধানে রঙ্গপুর নগরে সংস্কৃতালোচনার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া বঙ্গদেশে তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উহা বঙ্গোত্তর ভূমির একটি প্রধান চতুষ্পাঠীরূপে তর্করত্ন মহাশয়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় আজও দিতেছে। তাঁহার অভাবে এই শিক্ষার ধারা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তদ্বিষয়ে নাগরিকদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। রঙ্গপুর চতুষ্পাঠীতে (পাকা টোলে) দেশ বিদেশ হইতে বহু ছাত্র বিদ্যার্থী হইয়া আগমন করিত। ইনি প্রধানতঃ কাব্য ব্যাকরণ দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ভক্তি শাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সাধারণতঃ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ কোন এক বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিন্তু

ইঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, যে কোন শাস্ত্র অধ্যাপনায় ইনি তুল্য দক্ষতা প্রকাশ করিতেন সুতরাং একই স্থানে একই অধ্যাপকের নিকটে নানাশাস্ত্রের অধ্যয়নের সুযোগ হইবে বলিয়া বহু ছাত্র ইঁহার চতুষ্পাঠীতে আকৃষ্ট হইত। ইঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চুর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে হিন্দুদর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ে যাদবেশ্বর অবহিত ছিলেন। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকে ইঁহার পদতলে বসিয়া প্রাচ্য প্রতীচ্য দর্শনের তুলনায় সমালোচনা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং নতশিরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মণ্ডলীর বিশেষতঃ দার্শনিকদিগের দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা জটিল হওয়ায় সাধারণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহার অনুধাবন সহজসাধ্য হইত না। কিন্তু ইঁহার ব্যাখ্যা এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল যে শাস্ত্রের অতিদুরূহ অংশও সাধারণের পক্ষে অনায়াস আয়ত্ত হইত। এরূপ পাঠ দানের সহজ রীতি আর কুত্রাপি দেখা যাইত না তাহা তাঁহার তদন্তেবাসীমাত্রেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। পণ্ডিতরাজের ভাগবত ব্যাখ্যা যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। প্রভুপাদ মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যাভূষণ ও মধুসূদন স্মৃতিরত্নের সহিত ইঁহার স্মৃতির বিচার হইয়াছিল। উভয়ে তর্করত্ন মহাশয়কে বঙ্গের একজন অসাধারণ স্মার্ত্ত বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন।

উপাধি লাভ ও দান।

নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ সকল শাস্ত্রে তুল্যাধিকারী বলিয়া তর্করত্ন মহাশয়কে "পণ্ডিতরাজ" উপাধি এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত মণ্ডলী বারাণসী ধামে ইঁহাকে "কবিসম্রাট" উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডল হইতে ইনি "পণ্ডিতকেশরী" উপাধী লাভ করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ন্যায় উত্তরবঙ্গে ইনি রাজসরকার হইতে প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি বহু পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন। উপাধি অর্জ্জনের জন্য তাদৃশ আয়াস স্বীকার ইঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না বরং উপাধি অর্জ্জন অপেক্ষা দানেই ইঁহার অধিক প্রীতির কারণ হইত। বঙ্গের ঐতিহাসিক ও প্রধান আভিধানিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পণ্ডিতরাজ দত্ত "প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় "শ্রীকণ্ঠ", সরস সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "বিদ্যাভূষণ", ঐতিহাসিকবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি, এল, সি, আই, ই মহাশয় "পঞ্চানন" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "তত্ত্বসরস্বতী", ভক্তিশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "বিদ্যাভূষণ" এবং স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় "সরস্বতী" মহাশয় পণ্ডিতরাজের দত্ত উপাধি সাদরে ধারণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা ও আলোচনাদি।

ইনি অনর্গল শিষ্টউচ্চারণাদি সহ সংস্কৃত বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পণ্ডিতা রমাবাই কবিতায় ইঁহার সহিত কথোপকথন ও সমস্যাপূরণ করিয়া পরিতুষ্টা হইয়া ইঁহার নিকটে শিষ্যত্ব

স্বীকার করিয়াছিলেন। মিত্রগোষ্ঠি, বিদ্যোদয় প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার নানা সংস্কৃত সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল। সংস্কৃত মাতৃভাষা না হইলে এরূপ অনর্গল প্রসাদগুণবিশিষ্ট অলঙ্কার ঝঙ্কৃত শিষ্ট আর্যভাষা লেখনীতে বা বাক্যে পরিস্ফুট হইতে পারে না। "বাণ বিজয়" নামক একখানি সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ ইনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভাষার লালিত্যে ও অলঙ্কারের ছটায় ইহা পাঠ কালে কাদম্বরী বা দশকুমার চরিতের সম্পূর্ণ অনুকরণ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে যেরূপ গদ্যে তদ্রূপ পদ্যেও ইঁহার তুল্য কৃতিত্ব প্রকটিত হইয়াছিল। ইনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গুলি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুভদ্রাহরণ, চন্দ্রদূত, প্রশান্তকুসুম অশ্রুবিন্দুম, অশ্রুবিসর্জ্জনম্, রাজ্যাভিষেক কাব্যম্ রত্নকোষকাব্যম তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুভদ্রা হরণের কবিতা কালিদাসের কবিতা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্নপূর্ণা স্তোত্রম্ শিব স্তোত্রম্, গঙ্গাদর্শন কাব্যম্, ভারতগাঁথা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থাদি কাব্যামোদীর বিশেষ উপভোগ্য।

উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তনাবধি ইনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন এবং সংস্কৃত বোর্ডের একজন গণনীয় সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। আনন্দের সংবাদ এই যে, তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র কবিবর শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কৃতী পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় বর্ত্তমানে সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতির পদে সমাসীন হওয়ায় তর্করত্ন মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি যথেষ্ঠ সম্মানসহ উত্তরবঙ্গের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যসেবা!

ভাষাসাহিত্যের আলোচনা শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে একদা বিরল ও অবজ্ঞাত ছিল। দশবিধ সংস্কার ও দেবার্চ্চনা ও নিত্যউপাসনাদিতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে ভ্রমক্রমে মাতৃ ভাষার উচ্চারণ প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং পুনরাচমন পূর্ব্বক শুদ্ধবাক্ হইয়া কর্ম্মারম্ভের ব্যবস্থা হইতে ভাষাসাহিত্যের প্রতি এরূপ অবজ্ঞার ভাব আসিয়া থাকিবে। যাহা হউক, মাতৃভাষার প্রতি দেশের আপামর সাধারণ অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে পণ্ডিত সমাজের ভাবান্তর ঘটিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে মাতৃভাষাসেবী সাহিত্যিকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আমরা পূজনীয় পণ্ডিতরাজের নিজমুখে অবগত হইয়াছি যে "দ্রৌপদী" কাব্য রচনা করিয়া তাহার সহিত অন্তঃপুরচারিণীর নাম সংযুক্ত করার ইহাই প্রধান কারণ ছিল। যাহাহউক তাঁহার এবম্বিধ সঙ্কোচের ভাব কালের গতিতে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহার লেখনী চালনে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রায় বিংশবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রসার বৃদ্ধি কল্পে রঙ্গপুরে তাহার প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তর্করত্ন মহাশয় তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের সভাপতিরূপে এবং পশ্চাৎ রঙ্গপুর ত্যাগের পরে বিশিষ্ট সদস্যরূপে ইনি ঐ ক্ষুদ্র সভার উন্নতিসাধনে আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। উত্তরবঙ্গবাসী সাহিত্যিকবৃন্দ ইঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পরিষৎ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত এবং পশ্চাৎ রঙ্গপুর শাখা পরিষদের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়া নগরে আহূত

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিতে বরণ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ মহামহোপাধ্যায়কে অধ্যাপক সদস্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখার সভাপতির পদে বরণ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনদ্বয়ে তাঁহার পঠিত অভিভাষণ সাহিত্যিকদিগের নিকটে চিরকাল সমাদৃত হইবে। বাঙ্গলা দেশের মাসিক সাপ্তাহিক ও সাময়িক নানা জাতীয় পত্রিকায় ইঁহার রচিত বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইত। সেই সকল প্রবন্ধের একত্র সমাবেশে একাধিক সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইলে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় একত্রে পাইবার সুযোগ হইবে। বাঙ্গলা কবিতা রচনায় ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসম্রাট কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় "দ্রৌপদী" কাব্য প্রকাশিত হইলে বলিয়াছেন, "মেঘনাদ বধের" পরে এরূপ অমিত্রাক্ষরছন্দের ওজস্বিনী কবিতা আর আমরা পাঠ করি নাই। দ্রৌপদী কাব্য ছাড়া তিনি আর কোন বৃহৎ বাঙ্গলা কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি প্রকাশ করিতেন—"যৌবনে যখন ভাষা কাব্য রচনার অবতারণা করি নাই, তখন বার্দ্ধক্যে রসভাণ্ডার যখন শুষ্কপ্রায় তখন আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব না"। ভাষা সাহিত্যে তিনি অধিক গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই। যে কয়খানি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সংশয়নিরসন প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ, অশোক (উপন্যাস একাদশীতত্ত্ব, নিবন্ধাতত্ত্ব উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত আশা কাব্যের সমালোচনা, বঙ্কিমের মৃণালিনীর সমালোচনা, বিলাতী বিচার, "আমি একটি অবতার" প্রভৃতি কতকগুলি সমালোচনা ও সামাজিক নক্‌সার পুস্তিকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতী বাঙ্গলা ও আধুনিক সবুজ বাঙ্গলার মধ্যস্থানে ইঁহার বাঙ্গলা রচনা প্রণালী নির্ণীত হইতে পারে। সুতরাং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের যুগের লোক হইলেও ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দো-পাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুদিগের প্রণালীতে মাতৃভ ষাকে সেবা করিতেন। তাঁহার ভাষা ও ভাবে বৈদেশিকতার ছায়া স্পর্শ করে নাই; তিনি স্বদেশীয় ভাবে ও ভাষায় মাতাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্বদেশ প্রীতির পূর্ণ পরিচায়ক। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দো-পাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক গণের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত বিদ্যা-পতিছন্দে ইনি পত্র ব্যবহার করিতেন। ইঁহার বৈদেশিক বহু সাহিত্য বন্ধুদিগের মধ্যে এক এইচ, ষ্ট্রাইন আই, সি, এস্ মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার ষ্ট্রাইন রঙ্গপুরের কালেক্টর থাকা কালে তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত বন্ধুত্ব জন্মে। পশ্চাৎ ইনি রাজসাহী বিভাগের কমিশনার হইয়া ব্যক্তিগত স্বাধীন মত বলি দিয়া উর্দ্ধতন রাজপুরুষের অনুজ্ঞা অন্ধের ন্যায় পালন তাঁহার মত স্বাধীনচেতার পক্ষে অসম্ভব মনে হওয়ায় রাজকার্য্য হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। সুদূর সাগর পার হইতেও ইনি তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার করিতেন। মিষ্টার ভেভালি, মিষ্টার বিভারী স্যর জর্জ্জগ্রীয়ারসন, স্যর উইলিয়ম গেইট প্রভৃতি সাহিত্য ও ইতিহাসবেত্তা বৈদেশিক পণ্ডিতগণ সকলেই তর্করত্ন মহাশয়ের গুণমুগ্ধ ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক বহু সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল এবং তিনি যে স্থানে থাকিতেন তাহা সর্ব্বদাই একটি সুন্দর সাহিত্য পীঠে পরিণত হইয়া নানা রসের অবতারণায় সজীব হইয়া থাকিত, রঙ্গপুর অন্ধকার করিয়া তিনি কিয়দ্দিবস কাশীধামে এই সাহিত্য বৈঠক জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। হায়! তাঁহার অভাবে আজ সাহিত্য-কুঞ্জ নীরব হইয়া গিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনে পণ্ডিতরাজ।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তাঁহার স্বাধীন চিত্ত নীরব থাকিতে পারে নাই। তিনি রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আহূত জেলা সমিতির সভাপতিরূপে প্রকাশ্য বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেন। রঙ্গপুরে এই আন্দোলনের তীব্রতা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। বঙ্গের প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় রঙ্গপুরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্দোলনের তীব্রতা দমন করার জন্য তদানীন্তন রাজপুরুষ স্থানীয় নেতৃবর্গকে বিশিষ্ট শান্তিরক্ষকরূপে (Special Constable) কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায়ও এরূপ অপমানসূচক কার্য্য করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের নির্দ্দেশে এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। তিনি ইহার প্রতিবাদরূপে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করেন। মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগের জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ রাজকর্ম্মচারী ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের অনুরোধে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যুক্তিদ্বারা ইনি যাহা সঙ্গত মনে করিতেন, সমাজ বা অন্য কোন শাসনে সে মত তিনি কখনই পরিবর্ত্তন করিতেন না।

ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস।

সমগ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজের প্রতিকূলে ইনি সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে এরূপ মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। উত্তরবঙ্গের প্রধান হিন্দু সমাজ রাজবংশীদিগের ব্রাত্যত্ব ইনি প্রমাণ করেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ব্রাত্যত্ব দূর হওয়া তাঁহার মত বিরুদ্ধ ছিল। সমাজের জটিল সমস্যা সমাধানে তিনি কৃতপ্রযত্ন ছিলেন। বাল্য বিবাহ ও কলিতে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইতে পারে কিনা এ সকল বিষয়ে তাঁহার মত উদার ছিল। তাঁহার উদার ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মতের উল্লেখ করিয়া রাজপুরুষগণ স্বভাবতঃই তাঁহাকে রাজনৈতিক পণ্ডিত (Political) পণ্ডিত আখ্যা প্রদান করিতেন। বস্তুগত্যা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সকল আন্দোলনের সহিত তিনি অকপটভাবে যোগদান করিতেন এবং তাঁহার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। উচ্চ রাজপুরুষদিগের সমক্ষেও তিনি সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচ ভাবে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। ইহাতে রাজপুরুষেরা অসন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতেন।

এরূপ সর্ব্বগুণাধার স্বাধীনচেতা পাণ্ডিত্যের আধার মহাপুরুষকে হারাইয়া বঙ্গদেশ দীনা হইয়াছে, উত্তরবঙ্গ তমসাবৃত হইয়াছে। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছেন, বঙ্গদেশের সুধিবর্গ পরিষদের এই সাধুসঙ্কল্প সাধনে অবশ্যই সহায় হইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।
২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।
কলিকাতা।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
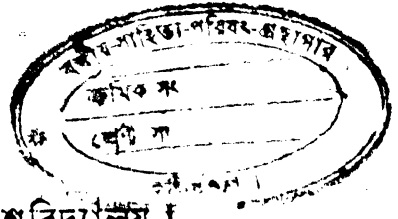
প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিশ্ববিদ্যালয় (Universities) বলিতে য়ুরোপের মধ্যযুগে বিভিন্ন শাস্ত্রচর্চ্চার বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠানকে বুঝাইত;—বিদ্যার্থীগণ নানা দেশ হইতে এই সমস্ত অধিষ্ঠানে সমবেত হইতেন, সংখ্যায় এ গুলি খুব কম ছিল। হিন্দুযুগেও অনেকটা এইরূপ ছিল। বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন বিভিন্ন শাস্ত্রের আধ্যাপনা করিতেন,—পরন্তু যাবতীয় শাস্ত্র একস্থানে অধ্যাপনা করিবার কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। বৌদ্ধযুগেই শুধু আমরা অনেকাংশে আধুনিক কালের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। এই সমস্ত অধিষ্ঠানগুলির মধ্যে তক্ষশীলা, কাঞ্চী, বিদর্ভ ও নালন্দাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়

তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুবিদ্যাধিষ্ঠান ছিল। তক্ষশীলাকে অনেকে অনেকরূপ নামকরণ করিয়াছেন। ইহাকে কেহ কেহ "চুসাশিলো" বলেন। হিউয়েনসাং ইহাকে "টা-চা-সি-লো" ও গ্রীক লেখকগণ টাক্সিলা (Taxila) বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ ইহার নাম দিয়াছেন "তক্কসির"। বৌদ্ধজাতকে লিখিত আছে যে কোন জন্মে বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধদেব যখন শালিদিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তখন এই স্থানে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রীর প্রাণ রক্ষার্থ তিনি আপনার শির দান করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই "তক্কসির" বা "তক্ষশালা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র তক্ষের নাম হইতেই এই নগরের নাম হইয়াছে "তক্ষশীলা"। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার নাম ছিল "অনন্ত্র"। যাহা হউক যেরূপেই ইহার নামকরণ হইয়া থাকুক ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। রামায়ণ মহাভারতে ইহার নাম পাওয়া যায়; বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাবকালে এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান ছিল। আলেকজান্দারের বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল মহাবীর আলেকজান্দার তক্ষশীলা অধিকারকরেন, ক্রমে ইহা মৌর্য্যবংশের, ব্যাকট্রিয়ারাজ ইউক্রেটাইডিসের, অবার নামক শকজাতির, কুশনরাজ কনিষ্কের ও গুপ্তরাজবংশের অধীনে আইসে। পরে কখন যে ইহা ধ্বংস কালের কুক্ষীগত হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া যায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহাবীর আলেকজান্দারের ভারত অভিযান কালে ইহা প্রসিদ্ধ বিদ্যায়তন ছিল। কূটনীতি বিশারদ চাণক্য, অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকার পাণিনি, গোভরণ, মাতঙ্গ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ তক্ষশীলার ছাত্র। চীনদেশীয়গণ, সম্ভ্রান্তবংশের রাজা ব্রাহ্মণ, বণিক প্রভৃতি বহুদূর দেশ হইতে বিদ্যার্জ্জনের জন্য এখানে দলে দলে আসিয়া সমবেত হইতেন।

বর্ত্তমান রাউলপিণ্ডির উত্তর পশ্চিম ও হাসান অব্দালের দক্ষিণ পূর্ব্বে ৩৩°১৭′ উঃ অক্ষ এবং ৭২°৪৯′১৫″ পূঃ দ্রাঘিমা মধ্যে ১২ বর্গ মাইল ব্যাপী যে ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয় তাহাই প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা নগর ছিল। তবে ইহার অবস্থিতি সম্বন্ধে চীন ও গ্রীকগণের মধ্যে

বিত্তর মত ভেদ দৃষ্ট হয়। ফাহিয়ান, সোঙ্গুন, হিউয়েনসাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকের মতে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বদিকে তিনদিনের পথে অর্থাৎ কালকাসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী শাহদেরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন তক্ষশীলার প্রকৃত অবস্থিতির স্থান। মনীষি কানিংহাম প্রমুখ সুধী-বৃন্দও ইহা স্বীকার করেন।

বৌদ্ধজাতকের উল্লেখ ও আলোচনা প্রসঙ্গে মনীষি বিউলার (Hofrath Biihler) ও শরচ্চন্দ্র দাসের উক্তি হইতে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ তাহারও পূর্ব্বে, তক্ষশীলা প্রথমে ব্রাহ্মণগণের পরে বৌদ্ধগণের বিদ্যাধিষ্ঠান হয় সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্র এই মহাবিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারিত। ছাত্রদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না। এখানে ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র ব্যাকরণ, বেদবেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। বিলাস-লালিত রাজকুমারগণকে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও কর্ম্মপটু করিবার উদ্দেশ্যে এখানে পাঠান হইত। এখানে প্রধান অষ্টাদশ প্রকার বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বহু বিদ্যালয় ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ অধ্যক্ষ থাকিতেন। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ভাস্কর্য্য চিত্রশিল্প, মুর্ত্তিনির্ম্মাণ বিদ্যা ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্পকার্য্যের (handicrafts) কথা জানা যায়।

কাঞ্চীর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচীন কাঞ্চী বর্ত্তমান পালার নদীর তীরবর্ত্তী কঞ্জিভেরাম জেলা। প্রাচীন কালে ইহা এক হাজার মাইল পরিধি বিস্তৃত দ্রাবিড়ের রাজধানী ছিল। দ্রাবিড়কে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং "তালাপিচা" ও ইহার রাজধানীর নাম "কি-য়েন-চি-পু-লো" অর্থাৎ কাঞ্চীপুর বলিয়াছেন। ইহার পরিধি ছিল পাঁচ মাইল। কাঞ্চীপুরের উত্তরে কঙ্কন ও ধানকাকাতা এবং দক্ষিণে "মালাকুতা" (বর্ত্তমান মাদুরা) বলিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কাঞ্চী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ধর্ম্মপাল ও বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজাচার্য্যের জন্মভূমি। খৃষ্টপূর্ব্ব কয়েক শতাব্দী হইতেই ইহা জ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। হুয়েনসাং যখন পল্লবরাজ নরসিংহ বর্ম্মণের (খৃঃ ৬২৫-৬৪৫) রাজত্বকালে ৬৪০ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চী নগরে ভ্রমণে আইসেন তখন ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানে প্রায় শতাধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। মহাযান ধর্ম্মভুক্ত স্থবির সম্প্রদায়ের অনূন ১০ হাজার জন ভিক্ষু এখানে থাকিতেন। এখানে প্রায় ৮০টি দেবমন্দির ছিল ও বহু সংখ্যক দিগম্বর জৈন ছিলেন। তখন বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘগুলি জ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জের সহিতও ইহার জ্ঞান চর্চ্চার সর্ব্বদা আদান প্রদান চলিত।

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহু বৌদ্ধসঙ্ঘারামেও জ্ঞান চর্চ্চা চলিত।

গয়া জেলার নওয়াদা মহকুমার মধ্যে "রাজগির" (মহাভারতীয় যুগের গিরিব্রজ, বৌদ্ধযুগের রাজগৃহ)। নামক একটি জায়গা আছে তথা হইতে ৭ মাইল উত্তরে "বড়গাঁও" নামক গ্রামের ২১ মাইল পশ্চিমে বহুদূর বিস্তৃত ভগ্নস্তূপরাশিই প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিচিহ্ন যুগের পর যুগ বহন করিয়া কালের ধ্বংসলীলা প্রচার করিতেছে। ইহা প্রাচীন ভারতের গৌরবস্থল, জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি ও বিদ্বমণ্ডলীর মিলনক্ষেত্র ছিল।

নালন্দার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত-বাদ লক্ষিত হয়। কথিত আছে মহামতি অশোক পাটলিপুত্র হইতে ৩০ মাইল দূরে ফল্গুনদীতীরে যে বিহার স্থাপন করেন তথায় আম্রোদ্যানের সরোবরে (বর্ত্তমানে ইহার নাম "কর্গিদাপুকুর") "নালন্দ" নামে এক নাগ থাকিত; তাহার নাম হইতেই "নালন্দা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে; ইহার প্রকৃত নাম "নরেন্দ্র বিহার"। আবার কেহ কেহ বৌদ্ধজাতক উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভগবান্ তথাগত পূর্ব্বজন্মে এখানে আবির্ভূত হইয়া জীবের দুঃখকষ্টে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া তাহাদের দুঃখ দূরীকরণার্থ নিজস্ব সমস্ত জিনিস বিতরণ করিয়াছিলেন। নিঃস্ব হইয়াও তাঁহার দান করিয়া তৃপ্তি হয় নাই। এই জন্য তাঁহার নাম হয় "না-অলম্-দা" (অর্থাৎ যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াও যাঁহার তৃপ্তি হয় না) এবং জায়গাটিও তখন হইতে "নালন্দা" নামে অভিহিত হইতে থাকে।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত নাগার্জ্জুন এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী "ধন্যকটক" নামক স্থানে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহারাজ অশোকের সময় নালন্দামঠ ক্ষুদ্রায়তন ছিল, তাঁহার পর শঙ্কর ও মুদ্গল গোমিন্ নামক ব্রাহ্মণদ্বয়ের চেষ্টায় ইহা বিশাল আকারে পুনর্গঠিত হয়। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং ও আইসিং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে ক্রমান্বয়ে চারিজন রাজার চেষ্টায় ইহা স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে অতুলন হইয়া উঠিয়াছিল, এবং বহু জ্ঞানী, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় ইহার সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছিল। হুয়েনসাংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় নালন্দার উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিহার চিত্রাঙ্কনে ও ভাস্কর্য্যে পরম রমনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ইহার সুগঠিত প্রাসাদ শ্রেণীর অভ্রভেদী উচ্চ গম্বুজ ও চূড়া বহুদূর হইতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহার অভ্যন্তরস্থ শ্যামায়মান স্নিগ্ধচ্ছায়া পুষ্পসৌরভমদির নিবিড় নিকুঞ্জ ও উদ্যানপ্রশস্ত নির্ম্মল সরোবরে বিকশিত নীলকমলরাজি ও শ্যামলপত্রবহুল ঘন সন্নিবিষ্ট আম্রবৃক্ষ সমূহ নালন্দাকে মনোরম নৈসর্গিক শোভাসম্পদে ভূষিত করায় ইহাকে চিত্রার্পিতবৎ মনে হইত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন স্রংসান্গাম্পো তিব্বতের রাজা (জন্ম খৃষ্টীয় ৬১৭ অব্দ) অনুমান তখন হইতেই ভারতীয় আচার্য্যগণ তিব্বতে জ্ঞান বিস্তার করিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে নালন্দার কয়েকজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রথম শান্তি রক্ষিত (কাহারও কাহারও মতে "শান্ত রক্ষিত")। ইনি বঙ্গদেশীয় জহর প্রদেশের রাজপুত্র ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ গৌড়রাজ গোপাল দেবের সমসাময়িক। ইনি তিব্বতরাজ স্রংসানগাম্পোর অধস্তন বংশধর খিস্রং দেৎসান্ (খৃষ্টীয় ৭৪০-৭৮৬ অব্দ) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। নালন্দামঠের তান্ত্রিক যোগাচার্য্য পদ্মসম্ভব শান্তিরক্ষিতের ভগিনী

মন্দারবাকে বিবাহ করেন। উদয়ন (বর্ত্তমান দর্দ্দিস্তান) ও সিন্ধুনদের পশ্চিম সুবর্ণদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ পদ্মসম্ভবের জন্মভূমি। ইঁহাদের উভয়ের সমবেত চেষ্টায় তিব্বতে প্রসিদ্ধ সামইয়ামঠ প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। পদ্মসম্ভব প্রথমে নেপালে ও পরে তিব্বতে গমন করেন (৭৪৭ খৃষ্টাব্দ)। কথিত আছে শান্তিরক্ষিত লামাপদের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি দেবোপম চরিত্র বলে তিব্বতবাসীগণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে "আচার্য্য বোধিসত্ব" নামে অভিহিত করিত। শান্তিরক্ষিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ও সংযম শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মাদির প্রবর্ত্তন করেন। শান্তিরক্ষিতের মত বহু বৌদ্ধাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য আহুত হন। একশত আট জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিতে থাকেন। অতঃপর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ রালপাচান্ সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিবার জন্য ভারতীয় পণ্ডিতগণকে তিব্বতে আহ্বান করেন। ইঁহারা তিব্বতে যাইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তিব্বতীয় ভাষাকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। সুতরাং তিব্বতীয় সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে তিব্বত ভারতের নিকট, বিশেষতঃ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনেকাংশে ঋণী।

গৌড়ের পাল রাজগণের সময়ই (খৃষ্টীয় ৭৭৫-১১৬১ অব্দ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইহার অন্যান্য অধ্যাপকগণের মধ্যে মাধ্যমিকমঠের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুন, নাগসেন, গুণমতি, বোধিসত্ব, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, জ্ঞানচন্দ্র, শীঘ্রবুদ্ধ, দিঙ্‌নাগ, গুণপ্রভ, সংঘদাস, বুদ্ধদাস, ধর্ম্মপাল, জয়সেন, চন্দ্রগোমিন্, চন্দ্রকীর্ত্তি, যশোমিত্র ভব্য বুদ্ধপালিত ও রবিগুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হুয়েনসাং সপ্তমশতাব্দীতে ভারত পর্য্যটনে আসিলে নালন্দাবাসীগণ পুষ্প সুগন্ধী প্রভৃতি উপচারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া উড্ডীয়মান্ পতাকাসহ মহাসমারোহে তাঁহাকে নগরে লইয়া গিয়াছিল। তথায় ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া তাহার যথোচিত সৎকার করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য মহাস্থবির শীলভদ্রের সঙ্গে তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া সসম্মানে তাঁহার বাসস্থান দেওয়া হয়। শীলভদ্র বঙ্গদেশীয় সমতট প্রদেশের এক ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার যৌবনকালের নাম দণ্ডসেন, দন্তভদ্র বা দুস্তদেব। হুয়েনসাংয়ের আগমনকালে শীলভদ্রের বয়ঃক্রম ১০৬ বৎসর হইয়াছিল। হুয়েনসাং ১০ বৎসরকাল নালন্দায় বাস করেন এবং "শব্দবিদ্যাসম্যুক্তশাস্ত্র" প্রণেতা ধর্ম্মপালের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে প্রতিভাবলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণকে পরাজিত করিয়া নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন।

নালন্দা বিহার ১৩০০ ফিট দীর্ঘ ও ৪০০ ফিট প্রশস্ত এক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ঘর ছিল। প্রত্যেক ঘরের বিস্তার ১২ হাত ৮ হাত। এখানে ১০ হাজার বিদ্যার্থী ও ১৫১০ জন অধ্যাপক বাস করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে ১০ জন

প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক ৫০ প্রকার বিভিন্ন শাস্ত্রে; ৫০০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ৩০, ও ১০০০ জন তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ২০টি বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বৃদ্ধ আচার্য্য শীলভদ্র সকল বিষয়েই ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও সর্ব্বশাস্ত্রেরই অধ্যাপনা অতি সহজেই করিতে পারিতেন। তদানীন্তন কালে সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অনন্য সাধরণ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিতে পারিলে কাহাকেও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ করা হইত না।

হুয়েনসাংয়ের আগমন কালে নালন্দার খ্যাতি সমগ্র এসিয়া মহাদেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যার্থীগণ শুধু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নয়—অন্যান্য বহুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে বিদ্যার্জ্জনের জন্য আসিয়া সমবেত হইতেন; এমন কি ২০০০ হাজার মাইল দূর হইতে আসিবার কথা জানা যায়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছয়টি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ ছিল। এখানে প্রায় ১৮ প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোক একতাবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে থাকিতেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া হেতুবিদ্যা (logic) শব্দবিদ্যা (grammar) চিকিৎসাবিদ্যা (medicine) ও শিল্পস্থানবিদ্যা (practical arts) পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইত। ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র ব্যতীত গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রও শিক্ষা দিবার কথা জানা যায়। চারুকলা ও হস্তশিল্প শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভাস্কর্য্য প্রতিমাচিত্রণ ও মন্দিরের আলঙ্কারিক চিত্র-কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। "রত্নোদধি" নামক গ্রন্থালয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক সংগৃহীত ছিল; তাহাতে নয়টি তলা ছিল। কথিত আছে অষ্টম শতাব্দীতে ইহা নাকি আগুণে পুড়িয়া যায়। হুয়েনসাং ও আইসিং উভয়ের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, নালন্দাতে রাজকীয় মানমন্দির ও সময় নিরূপণার্থ জলঘড়ি ও সূর্য্যঘড়ি ছিল। এই জন্যই সূর্য্যঘড়িকে "বেলাচক্র" বলিত। দিবারাত্র ৮ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগেই দামামাধ্বনি করিয়া সময় ঘোষণা করা হইত।

হুয়েনসাং নালন্দায় অবস্থানকালীন যোগশাস্ত্র দুইবার; ন্যায়ানুসারশাস্ত্র একবার, অভিধর্ম্মশাস্ত্র একবার, হেতুবিদ্যাশাস্ত্র দুইবার, শব্দবিদ্যাশাস্ত্র দুইবার, এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর হইতে আনীত পুস্তকাদি ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুস্তকাদিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মঠে অবস্থানকালে তিনি দেখিতেন দিবারাত্র শাস্ত্রালোচনা চলিতেছে ও প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশদভাবে বুঝিতে সাহায্য করিতেছে। ত্রিপিটকের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিলে তাহা বিশেষ লজ্জার কারণ হইত। এই জন্য অনেকেই দূরে দূরে থাকিতেন। বহুদূরদেশ হইতে যে সমস্ত বিদ্যার্থী আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রের জটিলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থীদের প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্নলোকের ১০ জনের মধ্যে ২।৩ জন মাত্র লওয়া হইত—প্রতিযোগিতায় অনেকেই সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না।

একশত গ্রামের রাজস্ব দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৃপতিবৃন্দ স্বেচ্ছায় ইহার যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিতেন। শুধু তাহাই নহে ছাত্র ও অধ্যাপকগণের জন্য নানারূপ দানও নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রত্যহ ১২০টী জবীর, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, ২৷৷০ তোলা কর্পূর ১পোয়া মহাশালী ধানের চাউল ও কিছু মাখন দেওয়া হইত ও ব্যবহার্য্য তৈলের মাসিক বরাদ্দ ছিল। ভিক্ষুগণকে উদরান্নের জন্য ভিক্ষার্থ বাহির হইতে হইত

না, সুতরাং ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্তমনে তাঁহাদের অধিকাংশ সময় শুধু জ্ঞানচর্চ্চায় নিয়োগ করিতে পারিতেন। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যাহাতে শৃঙ্খলা থাকে এবং ক্রমশঃ নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। অধ্যাপকগণ নানাস্থানে গিয়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। ভিক্ষুগণ সন্ধ্যাকালে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

প্রথমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণের নিয়ম ছিল না, পরে হয়। ঐ প্রতিষ্ঠা পত্রের (Certificate) উপরে "শ্রীনালন্দা মহাবিহারী আর্য্য-ভিক্ষু সংঘস্য" এই মোহর (seal) থাকিত, উহাতে একটি ধর্ম্মচক্র ও তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি হরিণের আকৃতি অঙ্কিত রহিত।

বিদর্ভ বিশ্ববিদ্যালয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় অথবা ৩য় শতাব্দীতে যখন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিৎ ও রাসায়নিক বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব হয় তখন বিদর্ভ (বর্ত্তমান বেরার) বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু ও বৌদ্ধ জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাংয়ের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় রাজা শতবাহু পর্ব্বত গাত্র খোদিত করিয়া একটা বিশাল মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার নাম শ্রীশৈল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় ইহাকে "ধন্য কট্টকের" * বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া বহু নিভৃত প্রকোষ্ঠ ও বিস্তৃত কক্ষ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মঠটি পঞ্চতলে বিভক্ত ছিল। প্রতিতলের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত চত্বর ছিল; প্রতিতলে জীবন্তপ্রতীম বুদ্ধদেবের স্বর্ণময়ীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। উচ্চতম তলে নাগার্জ্জুন বুদ্ধদেবের উপদেশমালা ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থরাজি রক্ষা করিতেন—নিম্নতম তলে বৌদ্ধেতর ধর্ম্মাবলম্বীগণ রহিতেন ও ভাণ্ডার ছিল। মধ্যের তিনটি তলে বৌদ্ধসংঘভুক্ত ভিক্ষুগণ থাকিতেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্যামাপদ বাগচী।

রঙ্গপুরের প্রাচীন ইতিহাসের একপৃষ্ঠা।

দশবৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে যৎকালে "রঙ্গপুরের ইতিহাস" প্রণয়নরূপ মহদুদ্দেশ্যের সহায়ক রূপে রঙ্গপুরে আগমন করি, তৎকাল হইতে এপর্য্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক সমস্যাই আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অদ্য একটি মাত্র সমস্যার উল্লেখ করিব। এই সমস্যাটি যৎকালে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তৎকালে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় আমার চিন্তাপথে উদিত হয়—সেই বিষয়টি এই যে প্রকৃত ইতিহাস প্রণেতার দায়িত্ব কিরূপ গভীর, অদ্যাপি আমি এই সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই — তাই সমবেত সুধিবৃন্দের সমীপে বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি।

* কেহ কেহ "শ্রীধান কটক" বলেন। প্রকৃত নাম কি তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

আপনারা সকলেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা অবগত আছেন। বাগ্মী, দার্শনিক ঔপন্যাসিক কবি, রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত কি স্বদেশে কি বিদেশে কাহারও দৃষ্টি এই ধ্বংসলীলাকে অতিক্রম করে নাই। "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের ঋষি অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠ গ্রন্থে এই মন্বন্তরের যে হৃদয় বিদারক চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি সার জনসোর এই মন্বন্তরের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভীষণতর ও করুণে কোন অংশে ন্যূন নহে। - উহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue,
Still hear the mothers' shrieks and infants' moans,
Cries of despair and agonising groans.
In wild confusion dead and dying lie;
Hark to the jackal's yells and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey.
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface.

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও চিন্তাশীল লেখক মেকলে এই মন্বন্তরের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার গৌরবে ও তীব্রতায় তাহা উল্লিখিত কবিতাংশের সহিত একরূপ আসন পাইবার যোগ্য।

সার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন যে, তৎকালীন রাজপুরুষগণের কথা ছাড়িয়া দিলে একমাত্র সার জন শোরই বেসরকারী ভাবে কবিতাকারে এই মহামারীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে "জে সি" স্বাক্ষরিত একটি বিস্তৃত বিবরণ বিলাতের "Gentleman's Magazine" নামক পত্রের দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা পরে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের "Annual Register" নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। চার্লস গ্রাণ্ট ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে বাঙ্গালা দেশে পদার্পণ করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে বাস করিতেছিলেন। গ্রাণ্ট ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে "Observation on the State of Society among the Asiatic subject of Great Britain" নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহার অংশ বিশেষে এই ভীষণ মন্বন্তরের বর্ণনা আছে। জি এফ, গ্রাণ্ড নামক জনৈক ইংরেজ পুরুষ "Narrative of a Gentleman" নাম দিয়া এই ভীষণ জনক্ষয়কর মন্বন্তর প্রসঙ্গে কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। কাপ্তেন জে, প্রাইস নামক অন্য একজন শ্বেতাঙ্গপুরুষ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে "Five Letters From a Free Merchant in Bengal" নাম দিয়া উল্লিখিত পত্রের প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন।

সুতরাং কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্র এই মন্বন্তরের প্রভাব সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল ; ওয়ারেণ হেষ্টিংস দ্বারা এই মন্বন্তরের বিবরণ অতিরঞ্জিত করা হইলেও

"the laboured descriptions in which every circumstances of fact, and every art of language have been accumulated to raise compassion" এই মন্বন্তরের ফলে যে বাঙ্গালার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মিল লিখিয়াছেন, "The first year of his (Cortiers) administration was distinguishod by one of those dreadful famines which so often affect the provinces of India—a calamity by which more than a third of the inhabitants of Bengal were computed to have been destroyed."

রঙ্গপুরের ইতিহাস প্রণয়ন ব্যাপারে "দুর্ভিক্ষ ও মহামারী" প্রভৃতির আলোচনা কালে আমার নিকট সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সমস্যা উপস্থিত, হয়। এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রসঙ্গে রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভাস তাহার "ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ—
"As far as can be ascertained from the Collectorate records, the only nstance of actual famine having been experienced in the District of Rangpur during the period which they cover was in the Bengali year 1190-1787–88 A.D.). Unfortunately the correspondence relating to 1770 he year of the previous great Bengal famine, is not forthcoming and no enformation is obtainable to show the extent to which the terrible scarcitiy of that year was felt in this District, nor do the records give any information as to whether the famine of 1733—84 extended to Rangpur." বলা বাহুল্য মিঃ ভাস এই স্থানে Sir William Hunter এর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র (Vid pages 293–24—Statistical Account of Bengal vol VII—Maldah, Rangpur & Dinajpur).

দেবীসিং ও রেজা খাঁর লীলাভূমি, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল, দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠকের জন্মস্থান রঙ্গপুর জেলাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর স্পর্শ করিল না, এই চিন্তা আমাকে প্রকৃতই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। মিঃ ভাস সার উইলিয়ম হাণ্টারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া একদিকে যেমন বলিয়াছেন দুর্ভাগ্যক্রমে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধে কোন প্রকারেরই চিঠিপত্র গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পরন্তু এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে রঙ্গপুরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনই সংবাদ বা যুক্তিপ্রমাণ পাইবার উপায় নাই" অন্য দিকে তেমনি ইংরেজ আমলে রঙ্গপুরের অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া লিখিলেন,—"In 1772 herds of dacoits re-inforced by disbanded troops from the native armies and by peasants ruined in famine of 1770 were plundering and burning villages in bodies of 5000, অর্থাৎ ১৭৭০ সালে দেশীয় সৈনাদল হইতে বিতাড়িত সৈনাসমূহ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে সর্ব্বস্বান্ত কৃষকমণ্ডলী পরিপুষ্ট দস্যুদল গ্রাম সমূহ দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল-ইহাদিগের সংখ্যা

কত ছিল নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না—তবে ইহাদিগের প্রতিদলে পাঁচ হাজার করিয়া লোক থাকিত।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য

বা

মণিভূমিকা কর্ম্ম।

পূর্ব্বের এক অধিবেশনে প্রাচীন ভারতের কলাবিদ্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই সভায় পঠিত হইয়াছিল। কলাবিদ্যা চতুঃষষ্টি শ্রেণীতে বিভক্ত ইহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। অদ্য সেই কলা সমূহের মধ্যবর্ত্তী দশম সংখ্যক "মণিভূমিকা কর্ম্ম" নামক কলা অবলম্বনে, এই প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। আমি প্রাচীন আর্য্য-মহর্ষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিব মাত্র। তাঁহাদের শিল্প বা স্থাপত্য অবলম্বিত বিষয়ের ভিত্তি।

বিশ্বশিল্পী বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের পদার্থ লইয়াই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান, কবি কাব্য, ঐতিহাসিক ইতিহাস লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সুনিপুণ স্থপতিও সেই রাজ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া নশ্বর জগতে স্থাপত্য কৌশল দেখাইয়া, অবিনশ্বর যশঃ উপার্জ্জন করেন এবং তদ্দ্বারা অনুরূপ লাভ করেন। এই স্থপতিগণের মধ্যে ভক্ত প্রেমিক স্থপতি, নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই স্থাপত্যকৌশল বিস্তার করেন, এবং প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ও প্রেমিক তাহাতে কৃতার্থ হন। হয় তঃ অনেকে আমার এই কথায় বলিবেন, যিনি নির্গুণ অর্থাৎ অরূপ তাঁর আবার সগুণমূর্ত্তি কি? এ প্রশ্নের উত্তর আমি সংক্ষ দুই একটি কথায় সপ্রমাণ করিব। আকারবিহীন বিদ্যুৎকে বৈজ্ঞানিক কৌশলে কোনও যন্ত্রে স্থাপিত করিয়া তাম্র নির্ম্মিত তারের সাহায্যে তদ্দ্বারা যেমন সাঙ্কেতিক শব্দের আদান প্রদানের কার্য্য সম্পাদন করেন, ভাবুক ভক্তও সেইরূপ নির্গুণ বিরাটব্রহ্মকে ধ্যানরূপ তারের সাহায্যে হৃদয়যন্ত্রে আনয়ন করতঃ প্রেম-ভক্তির সংযোগে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হন। জগতের অনিত্য সুখ দুঃখ ভুলিয়া যান, দেহ মন ও কর্ম্ম যাঁহাকে দান করেন তাহাই নির্গুণের সগুণ মূর্ত্তি। এ বিষয়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার অভিলাষ আমার নাই, তবে এইমাত্র বলিব যে, নির্গুণকে সগুণ না করিতে পারিলে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের তাঁহাকে ভাবিতে

বা জানিতে পারা কঠিন। তাই আমি পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিব। পরমহংসদেব সাধারণ কথায় শিষ্যকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত দর্শনের সার মর্ম্ম সুচারুরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি তাহাদ্বারা সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করিয়া প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইব।

কোনও শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—

মনগড়া মূর্ত্তি যদি মোক্ষের সাধন হয়,
স্বপ্নলব্ধ রাজ্য পেয়ে কেন আমি রাজা নয়?
"অজ্ঞানী প্রতিমা পূজে, জ্ঞানী পূজে সর্ব্বময়,
এই সব কথা প্রভো কেন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।
কেন তবে এত লোক প্রতিমা পূজায় রত,
তাহে যদি সত্য বস্তু নাহি হয় হস্তগত?"

তাঁহার উত্তরে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন :—

"সাগর সঙ্গম আর সেই হরিদ্বার,
এ সুদীর্ঘ পথে গঙ্গা ধায় অনিবার।
যেই ঘাটে স্নান কর নিস্তার পাইবে,
সব গঙ্গা পরশনে ফল যা লভিবে।
সান্ত মূর্ত্তি ধ্যানে তথা অনন্তেরে পাই,
সান্ত ধরা সোজা কিন্তু অনন্ত বালাই।
এক ঘটি জলে যদি তৃষ্ণা মিটে যায়,
পুকুরেতে কত জল কে তাহা মাপায়?
আধ বোতলেতে যেই মাতাল হইবে,
কত মদ দোকানেতে জেনে কি করিবে?
বিবিধ ছেলের তরে বিবিধ ব্যঞ্জন
যার পেটে যেবা সয় মা করে রন্ধন।
অধিকারী ভেদে তথা পূজার সৃজন
কারো নিরাকার কারো সাকার ভজন।
আগুনের মূর্ত্তি নাই আছে অঙ্গারের
পূজকের তরে ব্রহ্ম-মূর্ত্তি সাকারের।
বিবাহের পূর্ব্বে যথা পুতুলেতে মন,
ঈশ্বর লাভের পূর্ব্বে প্রতিমা পূজন।
স্বামী পেলে পুতুলেতে নাহি প্রয়োজন,
নিজ পারে প্রতিমাটি দিতে বিসর্জ্জন।"

গুরুদেবের এই কথা শুনিয়া শিষ্য পুনর্ব্বার বলিলেন :—

ভ্রমাত্মক নয় তবে প্রতিমা পূজন,
সাকার তরে কি মোরা করিব অর্চ্চন ?

রামকৃষ্ণ বলিলেন :—

"প্রতিমা পূজায় যদি ভুল হয়ে থাকে,
তিনিত জানেন জীব তাঁহাকেই ডাকে।
তিনি নিরাকার আর তিনিই সাকার,
ধরে থাক যেইটীতে বিশ্বাস তোমার।

গুরুদেবের এই কথায় শিষ্য ঘোরে পড়িলেন এবং পুনর্ব্বার সন্দেহ ভেঞ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন :—

বিপরীত ভাব দেব সম্ভব এমন ?
সাকার ও নিরাকার দুই একজন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণ বলিলেন :—

"ভক্তের নিকট তিনি সুন্দর সাকার,
জ্ঞানীর নিকটে নিত্য শুদ্ধ নিরাকার।
বেদান্তের জ্ঞান পথে ব্রহ্ম নিরাকার,
পুরাণের ভক্তিপথে সুন্দর সাকার।
রামরূপ ভালবাসে ভক্ত হনুমান,
তাই ধরে রাম মূর্ত্তি কৃষ্ণ ভগবান।
জ্ঞানবান জ্ঞান চক্ষে পারে হেরিবারে,
চিন্ময়ী প্রতিমাখানি মৃন্ময়ী আধারে।"

প্রভুর এই সমুদয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া যখন ভক্তশিষ্য সাকারের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কালী মূর্ত্তি, কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিয়া পূজন,
মানব নির্ব্বাণ মুক্তি লভে কি কখন ?"

ইহার উত্তরে গুরুদেব বলিলেন :—

"যবে রূপ বর্ণে চিত্ত একান্ত বিলয়,
সাধকের সিদ্ধিলাভ তখন নিশ্চয়।
শ্যামরূপ শ্যামামূর্ত্তি চোক্ষ পোয়া কেন,
দূরে যতরূপ আছে ততরূপ হেন।
শুদ্ধ মনে মা মা বলে যত কাছে যায়,
যেই জ্ঞান, সেই জ্ঞান দেখে চিন্ময়।
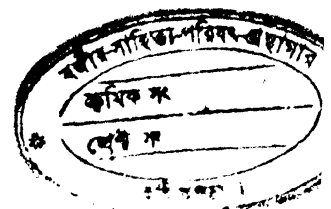
এতটুকু সূর্য্য দেখ দূরে আছে বলে,
কত বড় বোধ হবে তার কাছে গেলে।
কাছে নিরাকার দূরে সুনীল আকাশ,
শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ তথা জগতে প্রকাশ।
* ভক্তিভরে অবিরাম শ্যামেরে পূজিলে,
অরূপ ওরূপ রাশি দেখিবারে মিলে।
কেহ বলে কালীকৃষ্ণ পুনঃ বলে কেউ,
চিদানন্দ সাগরের চিন্ময় ও ঢেউ।
ভক্তিহিমে জমে ওই সাগর লহরী,
নিরাকারে সাকার কি রঙ্গ মরি মরি।
জল নিরাকার কিন্তু বরফ সাকার,
এমনি এ লীলা বুঝ অতি চমৎকার।
জ্ঞান সূর্য্য উঠে যদি, বরফ গলি যায়,
জল জল একাকার দশদিক ছলে ছায়।
আগে শিশু বড় লিখে, ছোট তার পরে,
স্থূল না চিনিলে সূক্ষ্ম আয়ত্ত কে করে।
প্রথমে সাকার চাই শেষে নিরাকার,
এইমত ঈশ্বরের পূজা আবিষ্কার।
ব্রহ্মসাগরের কভু পারাবার নাই,
লীলাময় হরি ভজে পার কূল পাই।"

পরমহংসদেবের এই বাক্যগুলিতে বেদ-বেদান্তের সারমর্ম্ম কেমন মধুর কেমন সুন্দর, কেমন উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে যিনি প্রকৃত ভাবুক, প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব এমন নিজের ভাষায়, ছেলে বুঝাইবার কথায় কে বলিতে পারিয়াছ? যিনি একাগ্রমনে ইঁহার উপদেশ পাঠ করিয়াছেন, তিনি সমুদয় দর্শনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মোপাসনা ভাবিতে, দেখিতে ও করিতে পারিয়াছেন। অজ্ঞ আমরা, জ্ঞান চক্ষু নাই এ জন্য অন্ধ, অতএব আমাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সরল উপদেশগুলি পাঠ করা প্রয়োজন, নতুবা দর্শনের জটিল কঠোর তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য ব্যস্ত হইলে আমাদের সব হারাইতে হইবে, সবদিক অন্ধকার দেখিতে হইবে। সদ্‌গুরুর সরল উপদেশের মধ্যদিয়া আমাদের মনকে গঠিত করিয়া লইতে হইবে। ইহা হইতে যে জ্ঞানলাভ হইবে তাহা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দর্শনে আমাদের চক্ষু সমর্থ হইবে। তখন আমরা ভক্তি ও জ্ঞানের তারতম্য বুঝিয়া লইতে পারিব। নতুবা কেবলমাত্র মুখের কথায় ভক্তি বা জ্ঞান লাভ হইবে না। জ্ঞানীর জ্ঞান অনেক বাধা

বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তবে ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে। ভক্তের ভক্তি অক্লেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়; তাহাতে বাধাবিঘ্ন কিছুই নাই। ভক্ত তাহার স্বভাব সুলভ ভাবের মধ্যে মা, পুত্র, কন্যা, সখা, সখী প্রভৃতি সেই সচ্চিদানন্দকে ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করেন; তাহাতেই তিনি মুক্তিরও অধিকারী হন সন্দেহ নাই। ভগবান স্বয়ং নন্দও যশোদাকে বলিয়াছিলেন:—

"যুবাং বৈত্রহ্ম ভাবেন পুত্র ভাবেন বা সদি।
চিন্তয়া নৌকৃতস্নেহো যাস্তেথেমদ্ গতিং পরাম্।"

(ভাগবতম্।)

এখন দেখিতে পাইবেন যে ভক্ত, পুত্রভাবে চিন্তা করিয়া ভক্তিবলে যে ফল লাভ করিতে পারে, জ্ঞানী অতি কঠোর জ্ঞানের বলে সেই ফল লাভ করে। তবে ভক্তির উদয় হইলে জ্ঞানের অপেক্ষা করে না, কিন্তু ভক্ত অনায়াসে জ্ঞানীর জ্ঞানলব্ধ ফলকে অধিকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। জ্ঞানী কিন্তু তাহা পারেন না; অতএব বলিব জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ভক্তের নিকটে তিনি সাকার, জ্ঞানীর নিকট তিনি নিরাকার। এই যে নিরাকারের পার্থক্য, ইহা লইয়া বিবাদ কিছুই নাই। তবে আমি বলিব যাঁহারা ভাণ করিয়া জ্ঞানী সাজেন তাঁহারা একুল ওকুল দুকুল হারান। তাঁহাদের কেবল মাত্র সং সাজাই সাজা। প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইলে যে সমুদয় গুণ থাকার প্রয়োজন, তাহা ভগবান্ গীতায় সুন্দররূপে বলিয়াছেন। সেই গীতোক্ত জ্ঞানলব্ধ মানবই প্রকৃত জ্ঞানী পদবাচ্য। ভক্তিদ্বারা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ইহা যোগসূত্রে উক্ত হইয়াছে। "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা";—অর্থাৎ ঈশ্বরে কায়িক বাচিক ও মানসিক প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তি বিশেষ দ্বারা আসন্নতম সমাধি লাভ করা যায়। বৈরাগ্য দ্বারা অতিমাত্র তীব্র সংবেগীর সমাধি লাভ যেমন আসন্নতম, ভক্তেরও সেইরূপ আসন্নতম। ভক্ত তাঁহার হৃদয়ের যে ভাব দ্বারা অরূপের রূপ কল্পনা করেন, তাহাই নিরাকারের সাকার রূপ। উদ্ধৃত পরমহংসদেবের বাক্যগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই সাকার মূর্ত্তিতেও বহু আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান আছে, তাহা আমরা সুনিপুণভাবে দেখিতে চেষ্টা করি না। আমাদের তাহাতে দৃষ্টি নাই এই জন্যই আমরা ভুল বুঝি। নিরাকার ব্রহ্মকে সাকারে পরিণত করিতে হইলে যেরূপে গড়িতে হয় তাহা আমরা জানিনা, তাহা আমরা বুঝিনা, এইজন্য আমাদের ভ্রম হয়। সাকার মূর্ত্তির মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে অগ্রসর হও দেখিবে উহাতে ব্রহ্মত্ব কেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তির তত্ত্বান্বেষণ করিলেই জানিতে পারিবে যে, এই মূর্ত্তিগুলিতে প্রকৃতি পুরুষের অপূর্ব্ব মিলন, অপূর্ব্ব বিকাশ, অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য কেমনভাবে বিজড়িত আছে। বেদান্ত দর্শনে "চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা। তমো রজঃ সত্ত্ব গুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।" মায়া নামে অভিহিতা। সাংখ্য দর্শনে এই মায়াকে প্রকৃতি ও ব্রহ্মকে পুরুষ বলা হইয়াছে।

পুরুষ বা ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, পুরুষ প্রকৃতি বা মায়ার সহিত মিলিত তখনই তিনি ঈশ্বর, আর সেই পুরুষ যখন অবিদ্যাশ্রিত তখন জীব এ সমুদয় তত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রে অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে। আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

তাই আমরা রাধা প্রকৃতির সহিত পুরুষ কৃষ্ণের, দুর্গা প্রকৃতির সহিত পুরুষ শিবের অপূর্ব্ব মিলন দেখিতে পাই। এইজন্য তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে "মায়িকস্তু মহেশ্বরঃ।" মহেশ্বরের মহেশ্বরত্ব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নতুবা তিনি নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ মাত্র। শিবের শিবত্ব, শক্তি বা প্রকৃতি কালীকে আশ্রয় করিয়া, নতুবা তিনি শব, এই জন্যই আমরা শিবের বুকে পরমা প্রকৃতি কালিকাকে দেখিতে পাই। এই জন্যই কৃষ্ণের সহিত মনোমোহিনী রাধিকা মূর্ত্তি দেখি, এই জন্যই রামের সহিত সীতার অপূর্ব্ব মধুর মূর্ত্তি দর্শন করি। পরমহংস ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরী স্তোত্রে—"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতিশক্তঃ প্রভবিতুং, নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" লিখিয়া প্রকৃতি পুরুষের মধুর মিলনে ব্রহ্মের ক্রিয়াকারিত্ব, সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও একদিন শিষ্য কর্ত্তৃক :—

কালী মূর্ত্তি শিরোপরি কেন অধিষ্ঠিত?
কৃষ্ণ সনে রাধা মূর্ত্তি কেন বিজড়িত?

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শব হ'য়ে প'ড়ে রয়।
প্রকৃতি তাঁহার যোগে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
পুরুষ প্রকৃতি যোগে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
তাই রাধা আর কৃষ্ণ একত্র দর্শন হয়॥
প্রকৃতিতে পুরুষের দৃষ্টি যোগ থাকা চাই।
তাই না বঙ্কিম আঁখি কৃষ্ণের দেখিতে পাই॥
কৃষ্ণ নীল, তাই রাধা সুনীল বসন পরা।
রাধাপীত, তাই কৃষ্ণ পরিহিত পীত ধড়া॥
রাধা গৌর, তাই শুক্ল কৃষ্ণের মুকুতারাজি।
কৃষ্ণ নীল, তাই রাধা সুনীল নোলকে সাজি॥
প্রকৃতি পুরুষ যোগে দেখাইতে শাস্ত্রকার।
বর্ণিয়াছে চারুমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার॥

এখন এই শিব দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তিতে যে ব্রহ্মত্ব আছে তাহা প্রমাণ সিদ্ধ; অতএব আমাদের স্বীকার্য্য। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা দেখিতে পাই —

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গুর্ণাস্তে।
যুক্তঃ পর পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে॥
স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি, প্রকৃতি আপ্তবাক্য ইহার বিশিষ্ট

প্রমাণ। আমরা এই ভারতবর্ষে লক্ষ্মী বাসুদেব, উমা-মহেশ্বর রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তি দেখি, সেগুলি ব্রহ্মের মূর্ত্তি। আর্য্যগণ জড় পুতুল পূজা করিতেন না ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণগুলির গবেষণা করিলে ইহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

এই মূর্ত্তি পূজায় অধিকারিভেদে দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূলে ইহাদের কোনও পার্থক্য নাই। সাধকের রুচির বৈচিত্র্যে ভগবন্মূর্ত্তিরও বৈচিত্র্য; তাই "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটীলনানা পথজুষাং; নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামার্ণবইব" এই কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। নদ নদী সকল যেভাবে যেদিক দিয়াই প্রবাহিত হউক না কেন, সকলেরই গন্তব্যস্থল যেমন এক সমুদ্র, সেইরূপ সাধক যেরূপে যে মূর্ত্তিরই কেন উপাসনা করুক না তাহার গন্তব্যস্থল সেই এক ব্রহ্ম। সাধক যে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাপ্যবস্তু না পান, সেই পর্য্যন্তই তাঁহার আ[illegible] সেই পর্য্যন্তই তাঁহার মূর্ত্তি, সেই পর্য্যন্তই তাঁহার সাধনা। অভিলষিত বস্তু লাভ করিলে সে নিষ্ক্রিয়, তাঁহার আর কিছুতে স্পৃহা বা আসক্তি থাকে না। তখন সে নিজকে চিনিতে পারিয়া কৃতার্থ হয়। আমাদের ততদূরে যাইতে এখনও শক্তি হয় নাই, [illegible] আমরা কর্ম্মী; অতএব আমাদের মূর্ত্তি পূজার প্রয়োজন। যতক্ষণ জ্ঞান না জন্মে [illegible] কর্ম্ম করিতে হইবে। জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কর্ম্ম [illegible] আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। গীতায় ভগবান্ এই সার উপদেশ দিয়াছেন।

অধিকারিভেদে মূর্ত্তি ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই মূর্ত্তিগুলি কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহাও আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সাধকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। শাস্ত্রে আছে :—

"অর্চ্চকস্ত তপোযোগাৎ অর্চনস্যাতি শায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চবিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি॥"

অর্চ্চকের তপোযোগ অর্চনার আতিশয্য ও প্রতিমার সারূপ্য হইলে দেবতার সান্নিধ্য হয়; অতএব যা তা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করিলে চলিবেনা। শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুরূপিণী মূর্ত্তি গঠন করিতে হইবে। সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনায় সে সাফল্য লাভ করিবে। এই নির্ম্মাণকার্য্যের উপদেষ্টা ঋষিগণ। তাঁহারা জাতিবিশেষের উপর এই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, একার্য্যে তাঁহাদেরও বিশেষরূপ নৈপুণ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া না থাকায় এই নির্ম্মাণকার্য্য বিকৃত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাড়ী, মুচি প্রভৃতি জাতিও এই প্রতিমা নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে কাহারও তাদৃশ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃত দেবমূর্ত্তি আর বর্ত্তমানে দেখা যায় না। এখন অধিকাংশ দেব মূর্ত্তিই নর-মূর্ত্তির অনুরূপ। আবার কোনও কোনও মূর্ত্তি নরমূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তির সংমিশ্রণে নির্ম্মিত। প্রাচীন মূর্ত্তিতে আমরা এখনও প্রকৃত দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাই। চিত্রকর্ম্মে সুনিপুণ রাজা রবিবর্ম্মার চিত্রিত দেব মূর্ত্তিগুলিতে মনুষ্য মূর্ত্তির বিকাশ দেখা যায়, দেব মূর্ত্তির অংশ বা লেশও তাহাতে পরিদৃষ্ট

হয় না। এ কথায় কাহারও যদি সন্দেহ হয় তবে তিনি প্রাচীন একখানি মূর্ত্তি লইয়া রাজা রবিবর্ম্মার নির্ম্মিত মূর্ত্তির সহিত তুলনা করিলেই ইহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। দেব মূর্ত্তি ও নর মূর্ত্তিতে অনেক পার্থক্য আছে। আমি ক্রমে তাহা প্রমাণ দ্বারা দেখাইব।

সাধক ধ্যানানুরূপিণী মূর্ত্তি কোন্ কোন্ বস্তুদ্বারা নির্ম্মাণ করিবেন তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

সৌবর্ণী রাজতীবাপি তাম্রীরত্নময়ী শুভা।
শৈল দারুময়ীবাপি লৌহ সীসময়ী তথা॥
মৃত্তিকা ধাতু যুক্তা বা তাম্র কাংস্যময়ী তথা।
শুভ দারুময়ীবাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে॥

সুবর্ণ রজত, তাম্র, রত্ন, পাষাণ, কাষ্ঠ, লৌহ, সীস দ্বারা অথবা স্বর্ণাদি ধাতুযুক্ত কাঁসাদ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। আজ আমি এই প্রবন্ধে প্রাচীনা শৈলীমূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিব। শৈলী অর্থাৎ পাষাণময়ী মূর্ত্তির ও অন্যান্য ধাতুময়ী মূর্ত্তির নির্ম্মাণ নিয়ম একরূপ। কাজেই পৃথক ২ ভাবে প্রত্যেকের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আজ আমি কেবলমাত্র ভগবান বাসুদেবের মূর্ত্তির বিষয় লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই মূর্ত্তির উচ্চতার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে :—

"অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বাদারভ্য বিতস্তিং যাবদেবতু।
গৃহে বৈ প্রতিমা কার্য্যানাধিকা শস্যতে বুধৈঃ॥ মৎস্য।

গৃহমধ্যে অর্থাৎ নিজের গৃহে যদি প্রতিমা স্থাপিত হয়, তবে তাহার উচ্চতা অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এক বিতস্তি (বিঘত) পর্য্যন্ত হইবে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব হইতে ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপন করিবেনা এবং বিতস্তির অধিক মূর্ত্তিও স্থাপন করিবে না। ইহা সাধকের গুপ্ত উপাসনার দেবতা। প্রাসাদে মূর্ত্তি স্থাপিত করিতে হইলে তাহার পরিমাণ :—

আষোড়শান্ত প্রাসাদে কর্ত্তব্যা নাধিকা ততঃ।
মধ্যোত্তম কনিষ্ঠাতু কার্য্যাবিত্তানুসারতঃ॥ মৎস্য।

প্রাসাদে অর্থাৎ মন্দিরে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হইলে তাঁহার উচ্চতা এক হাত হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ হস্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে। কুর্পুর (কেঁউই) হইতে মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্য্যন্ত হস্ত পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাসাদে ইহার ন্যূন পরিমিত মূর্ত্তি স্থাপন করিবে না।

আমরা যে সমস্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাই সেগুলি প্রায়ই এক হস্তের ন্যূন নহে। ইহার অধিক উচ্চ মূর্ত্তি অনেক দেখা যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পুরাকালে অধিকাংশ উপাসকের অবস্থা ভাল ছিল। এইজন্য তাঁহারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। প্রাসাদে যেরূপ মূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থিত মূর্ত্তিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি যে যে স্থানে পাষাণময়ী প্রতিমা দেখিয়াছি,

সেই সেই স্থানে প্রায়ই ভগ্ন মন্দির দেখিতে পাইয়াছি। সেই সমুদয় ভগ্ন মন্দিরের শিল্প চাতুর্য্য, পুরাকালের স্থাপত্যের চিহ্নস্বরূপে এখনও অবস্থান করিয়া আমাদের মনে অনেক ভাব, অনেক কথা, অনেক স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। ইহাতে আমরা বোধ করি যে পুরাকালে স্থাপত্যবিদ্যা আর্য্যাবর্ত্তে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আর দেখি যে শিল্পীদের নির্ম্মাণ চাতুর্য্য বিশেষরূপে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। .

পরিবর্ত্তনশীল সময়ের যবনিকা উদ্ঘাটন করিয়া আমরা যাহা দেখিতে পাই. তাহাতে প্রাচীন স্থপতিগণের স্থাপত্য কৌশলদর্শন করিয়া মুগ্ধ হই কিন্তু সে স্থাপত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শক্তি হয়না। সুদূর অতীতের কথা নয় চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে যে সমুদয় স্থাপত্য বিদ্যমান ছিল তাহা উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে বা বলিতে পারেন, আমি এ বিষয়ে কিছু বলিবনা। যাহা হউক এখন আমার অভিধেয় অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তু দেব দেবীর মূর্ত্তি এবং স্থাপত্যকৌশল প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ; অতএব এই প্রবন্ধের প্রয়োজন অভিধেয় সম্বন্ধ নিশ্চিত হইল।

মূর্ত্তির পরিমাণ অর্থাৎ উচ্চতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি এখন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রণালী বলিব। দেবাঙ্গের পরিমাণ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

স্বকীয়াঙ্গুলিমানেন মুখং স্যাদ্দ্বাদশাঙ্গুলং।
মুখ মানেন কর্ত্তব্যা সর্ব্বাবয়ব কল্পনা॥

যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে; তাহার অঙ্গুলির পরিমাণে মূর্ত্তির মুখ বার অঙ্গুলি হইবে। মুখের পরিমাণে সর্ব্বাঙ্গের কল্পনা করিবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে মূর্ত্তি নির্ম্মিত না হইতেই তাহার অঙ্গুলি পরিমাণ কিরূপে পাওয়া যাইবে? এই সন্দেহে, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ও নারদীয় পুরাণে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের পূর্ব্বে কিরূপে তাহার অঙ্গুলির পরিমাণ জানিতে পারা যাইবে, তাহা লিখিত হইয়াছে।

"অভিপ্রেতু প্রমাণস্থ নবধা প্রতিভাজয়েৎ।
নবমে তাস্করৈ ভক্তে ভাগঃ স্বাঙ্গুল মুচ্যতে॥ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র
বিম্বমানস্তু নবধা প্রোচ্ছ্রায়াৎ সং বিভাজ্য বৈ।
ভাগং ভাগং ততোভূয়ো-ভজেদ্ দ্বাদশধা দ্বিজ॥
তদঙ্গুলং স্যা দ্বিম্বস্ত………………" নাঃ পুঃ।

শিল্পী, যে শিলায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, সেই শিলা দৈর্ঘ্য প্রস্থে চতুরস্র হওয়া কর্ত্তব্য। সেই চতুরস্র শিলাখণ্ডের দৈর্ঘ্য একগাছি সূতাদ্বারা মাপিয়া তাহাকে নয় ভাগে বিভক্ত করিবে, এই নয় ভাগের প্রত্যেক ভাগ তাল নামে অভিহিত হইয়াছে। এই তাল বা নয় ভাগের এক ভাগকে বার ভাগে বিভক্ত করিলে, নির্ম্মাণাভিপ্সিত মূর্ত্তির অঙ্গুলি হইবে অর্থাৎ দেবতার অঙ্গুলির তাহাই পরিমাণ, জানিতে হইবে। এই অঙ্গুলির পরিমাণে, যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে তাহার মুখমণ্ডল বার অঙ্গুলি হইবে। ……

মূর্ত্তিভেদে অঙ্গ বিশেষেরও পরিমাণের কিছু কিছু ভেদ হয়। ভগবান্ বাসুদেবের—

শঙ্খচক্রধরং শান্তং পদ্মহস্তং গদাধরং॥
ছত্রাকারং শিরস্তস্য কম্বুগ্রীবং শুভেক্ষণং।
তুঙ্গনাসং শুক্তিকর্ণং প্রশান্তোরুভুজ ক্রমং॥
কচিদষ্ট ভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজ মথাপিবা।
দ্বিভুজংবাপি কর্ত্তব্যং ভবনেষু পুরোধনা॥

শঙ্খ চক্র গদা-পদ্মধর শান্ত, তাঁহার শির ছত্রাকার, গ্রীবাদেশ ত্রিরেখাযুক্ত চক্ষু সুন্দর ও বিস্তৃত, নাসিকা উচ্চ, কর্ণ ঝিনুকের ন্যায় উরু ও ভুজদ্বয় প্রশান্ত। ইনি কখন অষ্টভুজ, কখন বা চতুর্ভুজ আবার কখন দ্বিভুজ। অষ্টভুজ বাসুদেবের হস্ত সমূহের মধ্যে দক্ষিণ চতুর্হস্তে—

খড়্গোগদা শরং পদ্মং দেয়ং দক্ষিণহস্ততঃ।
ধনুশ্চ খেটকঞ্চৈব শঙ্খচক্রেচ বামতঃ॥"

খড়্গ, গদা, বাণ ও পদ্ম এবং বাম চতুর্হস্তে ধনু ঢাল, শঙ্খ ও চক্র প্রদান করিবে অর্থাৎ অষ্টভুজ বাসুদেবের হস্ত সমূহে পূর্ব্বোক্ত আয়ুধাদি আছে। চতুর্ভুজ বাসুদেবের দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে—

দক্ষিণেন গদাং পদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ
বামতঃ শঙ্খ চক্রে চ কর্ত্তব্যে ভূতি মিচ্ছতা॥

পদ্ম এবং বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র থাকিবে। দ্বিভুজ বাসুদেবের হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে শঙ্খ ও চক্রমাত্র থাকিবে। এই চতুর্ভুজ যদি কৃষ্ণাবতার হন তবে তিনিও বাসুদেব। তাঁহার বাম হস্তে গদা থাকিবে অবশিষ্ট হস্তগুলিতে যদৃচ্ছা ক্রমে শঙ্খ চক্র ও পদ্ম প্রদান করিবে; ইহার সম্বন্ধে অন্য কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। অর্থাৎ যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বামহস্তে গদা ও অন্যান্য হস্তে শঙ্খ চক্রাদি থাকিবে তিনি কৃষ্ণ জানিতে হইবে।

"কৃষ্ণাবতারেতু গদা বাম হস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খ চক্র মুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ॥

এই সমুদয় বাসুদেব মূর্ত্তির পাদদ্বয় মধ্যে পৃথিবী, দক্ষিণে প্রণত গরুড়, বামে পদ্মহস্তা সুন্দরী লক্ষ্মী এবং উভয় পার্শ্বে পদ্ম ও বীণাধারিণী শ্রী ও পুষ্টিদেবী অবস্থিতা। তোরণের উপরিভাগে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী এবং দেব দুন্দুভি যুক্ত গন্ধর্ব্ব মিথুন অবস্থিত। উহা নানাবিধ পত্র লতা সিংহ বাঘ্র প্রভৃতি প্রাণী ও কল্পলতাবলী দ্বারা সুশোভিত। উহাতে ভগবানের স্তব করিবার জন্য ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা অবস্থিত। মূর্ত্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগের প্রমাণে পীঠিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়। দেব দানব ও কিন্নরগণের মূর্ত্তিও উচ্চে নবতাল পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে হয়।

পূর্ব্বে অঙ্গুলির পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে, অন্য প্রকারেও অঙ্গুলির পরিমাণ গ্রহণ করা যায় তাহাও লিখিত হইতেছে। জালান্তর প্রবিষ্ট সূর্য্য কিরণ সম্পর্কে যে রজঃ দৃষ্ট হয় তাহাকে ত্রসরেণু বলে। আট ত্রসরেণুতে এক বালাগ্র, আট বালাগ্রে এক লিখ্যা আট লিখ্যাতে এক যুকা, আট যুকাতে এক যব, আট যবে এক অঙ্গুলি, আর্য্য মহর্ষিগণ এইরূপে অঙ্গুলি প্রমাণ

নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই অঙ্গুলির প্রমাণ সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যে গৃহীত হইত। চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হস্ত বা হাত। এই হস্ত পরিমাণে প্রতিমার মাপ গ্রহণ করিয়াও দেবমূর্ত্তি সকল নির্ম্মিত হইত। এবং পূর্ব্ব নিরূমিত অঙ্গুলির মাপে দেবতার শরীরাদির পরিমাণ স্থির করা হইত।

এখন এই প্রতিমার অঙ্গাদির পরিমাণ বিস্তারিত ভাবে বলিব। শিল্পী শিলার মধ্য সূত্রদ্বারা মাপিয়া নবধা বিভক্ত করিলে, তাহার নবমাংশের একাংশের যে পরিমাণ হইবে তাহা স্বাঙ্গুল নামে এবং স্বাঙ্গুল গোলক নেত্র নামে অভিহিত হইবে, অর্থাৎ তাহাই নেত্র কোটরের মাপ হইবে। পরে অপর এক ভাগ ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া পার্ষ্ণি, জানু ও গ্রীবাংশ কল্পনা করিবে। মুকুট মুখ, কণ্ঠ হৃদয় এবং নাভি ও মেঢ্র (শিশ্ন) অন্তরাল ভাগ, এক এক তাল মাত্র কল্পনা করিয়া, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় তালদ্বয় পরিমিত করিবে।

ইহাতে আমরা যদি কিছু ভুল বুঝি এই জন্য গ্রন্থকার পরে, এই ভাগগুলিকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য অঙ্গুলি দ্বারা মাপিয়া, দেবশরীর নির্ম্মাণের বিশদ ব্যবস্থা করিয়াছেন। নির্ম্মিৎসমান দেবতার অঙ্গুলি প্রমাণ সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ললাট নাসিকা ও মুখ দৈর্ঘ্যে চারি অঙ্গুলি; গ্রীবা ও কর্ণ চতুরঙ্গুল আয়ত, হনু (চোয়ালি) ও চিবুকের (থুঁতি) বিস্তার দুই অঙ্গুলি। ললাটের বিস্তার অষ্টাঙ্গুল; শঙ্খদ্বয় (কর্ণ সমীপাস্থি) দুই অঙ্গুল বিস্তার করিয়া তাহা অলকা দ্বারা আবৃত করিবে। কর্ণ ও নেত্রের অন্তরাল চতুরঙ্গুলি পরিমিত। [illegible] দুই অঙ্গুল [illegible] ভ্রূদ্বয়ের সমসূত্রে কর্ণচ্ছিদ্র নির্ম্মাণ করিবে। বিদ্ধকর্ণ ষড়ঙ্গুল, অবিদ্ধ কর্ণ পঞ্চাঙ্গুল অথবা চতুরঙ্গুল করিবে। অথবা বিদ্ধকর্ণ চিবুকের (থুঁতি) পরিমাণানুসারে নির্ম্মাণ করিবে। কর্ণে আয়ত গন্ধপাত্র খাত ও আবর্ত্তযুক্ত কর্ণশঙ্কু কল্পনা করিবে। অধরের পরিমাণ দুই অঙ্গুলি, ওষ্ঠ এক অঙ্গুলি, নেত্র অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত। অন্যান্য বক্ত্র (মুখ) চতুরঙ্গুল বিস্তৃত ও সার্দ্ধাঙ্গুল বৈপুল্যযুক্ত, ব্যাত্ত বৃহত্তর বক্ত্রের বৈপুল্য তিন অঙ্গুল পরিমিত হইবে। নাসাপুট ও নাসাগ্রের উচ্চতা যথাক্রমে এক ও দুই অঙ্গুলি হইবে। নাসাগ্রভাগ করবীর পুষ্প সদৃশ হইবে। চক্ষুর্দ্বয়ের পরস্পরের অন্তর চারি অঙ্গুলি। চক্ষুঃ কোণ দুই অঙ্গুল। চক্ষুঃকোণের অন্তরও দুই অঙ্গুল। চক্ষুর তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাণে তারা ও দৃক্‌তারা অর্থাৎ মণি পঞ্চমাংশ পরিমিত। নেত্রের বিস্তার তিন অঙ্গুলি, অর্দ্ধাঙ্গুল দ্রোণী এবং ঐ পরিমাণে ভ্রূলেখা অর্থাৎ ভ্রূর বিপুলতা অর্দ্ধাঙ্গুল, ভ্রূ দুইটী সমান হইবে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্য অন্তরাল দুই অঙ্গুল; ভ্রূর দৈর্ঘ্য চতুরঙ্গুল। বাহুল্যাদির মস্তকের বেষ্টন বত্রিশঙ্গুলি পরিমিত হইবে। গ্রীবার অধোভাগের বিস্তার বেষ্টন পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল পরিমিত হইবে। গ্রীবার বিস্তার অষ্টাঙ্গুল, উচ্চতা তিন অঙ্গুলি। গ্রীবা ও বক্ষদেশের অন্তরাল গ্রীবার দ্বিগুণ হইবে। স্কন্ধদ্বয় অষ্টাঙ্গুল; অংশদ্বয় উহার তিন অংশ। বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য বিত্রিংশৎ অঙ্গুল। বাহুর অগ্রভাগ ষোড়শাঙ্গুল। ঊর্দ্ধবাহু পর্য্যন্ত অষ্টাদশাঙ্গুল। দ্বিতীয় বাহু পর্ব্বের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত

সপ্তদশাঙ্গুল। বাহু মধ্যের বিস্তার অষ্টদশাঙ্গুলি, প্রবাহের মধ্যস্থল ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃত। করাগ্র বিস্তারে ষড়ঙ্গুল। করতল দৈর্ঘ্যে সপ্তাঙ্গুল, মধ্যমাঙ্গুলির পরিমাণ সপ্তাঙ্গুল, তর্জ্জনী পঞ্চাঙ্গুল, অনামা সাড়ে চারি অঙ্গুল এবং কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠা চারি অঙ্গুল দীর্ঘ। অঙ্গুষ্ঠার দুই পর্ব্ব এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলির তিন তিন পর্ব্ব বিন্যাস করিবে। অঙ্গুলি সমুদয়ের পূর্ব্বার্দ্ধ পরিমাণে নল হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন বিদ্যানিধি।

কবি গোবিন্দদাসের কড়চা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী মহাশয় গত ১৭ই ফাল্গুন তারিখের স্থানীয় পত্রিকা "বার্ত্তায়" কবি গোবিন্দ দাসের "কড়চা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার দুই একটী কথা বলিবার আছে। গোড়া বৈষ্ণব সমাজে এ গ্রন্থ সমাদৃত না হইবারই কথা। কারণ এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এমন কয়েকটী কথা আছে যাহা কোন গোড়া বৈষ্ণবই পছন্দ করিবেন না। বহুদিন পূর্ব্বে অনেকে এই গোবিন্দদাসের (কর্ম্মকার) অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না; নানাবাদ প্রতিবাদের পর তাঁহারা কেবল মাত্র এই গৌরাঙ্গ পার্শ্বচর ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এমন নহে, তিনি যে চৈতন্য দেবের সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রায় দুই বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। সম্প্রতি উক্ত কড়চা গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ শ্রেণীর অন্যতম পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হওয়াতে আবার দেশময় নানা বিরুদ্ধবাদী দলের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের প্রায় সকলেই যে গোড়া বৈষ্ণব ইহা বলাই বাহুল্য। লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর নির্ব্বিচারে ইহাকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ বিরচিত "চৈতন্যমঙ্গল" একখানি বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ।

কেন যে "মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার"
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাজল॥

চৈতন্য মঙ্গলে দৃষ্ট হয় তৎসম্বন্ধে গোড়া বৈষ্ণবদল সন্তোষ জনক প্রমাণই দিতে পারেন নাই। গোবিন্দ দাস যে মহাপ্রভুর সহিত দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা এই গ্রন্থে উল্লেখ

আছে। এই কড়চা গ্রন্থ ভক্তিভাজন জয়গোপাল গোস্বামী প্রথমে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে প্রচার ও প্রকাশ করেন। তিনি একজন পরমবৈষ্ণব হইয়াও এবং শান্তিপুরের প্রসিদ্ধগোস্বামী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেন যে এইরূপ কৃত্রিমতারূপ হীন ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তাহা সকলেরই ধারণার অতীত। তিনি ইচ্ছা করিলে এই গোবিন্দ দাসকে ব্রাহ্মণ জাতীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সত্য কখনও গোপন থাকে না। সত্যের অপলাপ শক্তি মানুষের কখনও নাই। এই কড়চা গ্রন্থের প্রসিদ্ধ গুণ এই যে ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্রও নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ কড়চা গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধান করা যাইতে পারে :—

(১) "চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত" এই উভয় গ্রন্থই মহাপ্রভুর তিরোধানের বহু পরে রচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী তৎপ্রণীত "বঙ্গরত্ন (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "চৈতন্য ভাগবত ১৫৭৫ খৃঃঅব্দে প্রণীত হয়।" ১৭১৫ খৃঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। আমাদের মনে হয় এই উভয় গ্রন্থেরই অনেক কথা প্রবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কোনও কথা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাত হইয়া লিপিবদ্ধ করা এই পরম সৌভাগ্যবান্ বৈষ্ণব চূড়ামণি-দ্বয়ের সৌভাগ্যে ঘটে নাই তাঁহারা সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমেই অথবা বর্ত্তমানে ও অজ্ঞাত কোন কারণ বশতঃ ইচ্ছা করিয়াই কবি গোবিন্দ দাসের কথা উল্লেখ করেন নাই। প্রাচীন অনেক গ্রন্থকারই অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিনয় নম্রতার নিমিত্ত তাঁহাদের জীবনকালে তাহা প্রকাশ করেন নাই। পরে তাহা বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের হাতে পড়িয়া লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার মৃত্যুর পরেও ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করা তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। বিশেষতঃ এই কড়চায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ আছে যাহা তৎকালে প্রচার হইলে জনসমাজে বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইত।

(২) বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দের সুপ্রসিদ্ধ "চৈতন্য মঙ্গলে" ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের (কর্ম্মকার) উল্লেখ আছে। এই পুস্তক বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ আদৃত ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খৃঃ হইতে ১৫১৭ খৃঃ মধ্যে জয়ানন্দ বর্দ্ধমান জেলাস্থ কোনও গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমানস্থ কাঞ্চননগর নিবাসি কড়চা লেখক এই গোবিন্দদাস ১৫০৮খৃঃ স্ত্রী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া গৃহত্যাগী হন। আমাদের মনে হয় জয়ানন্দ সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসকে নিজে দেখিয়াছিলেন বা সাক্ষাৎভাবে তাহার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন; এবং এইজন্য তাঁহার গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দ দাসের কড়চার ন্যায় ইতিহাস রচনার উপাদানের অমূল্য আকর।"

(বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ ৩১৩ পৃষ্ঠা)

(৩) এই গ্রন্থের ভাষা আধুনিক নহে। পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর লিখিত গ্রন্থের ভাষার]

সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ আছে। প্রাচীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভাষানৈপুণ্য ইহাতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। তবে ইহাতে দুই একটী শব্দও যে সংযোজিত ও সংশোধিত হয় নাই তাহা আমরা বলিতে চাহি না। প্রায় সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থই অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এইশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থকে ত্যাগ করা যায় না।

(৪) জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থের রচয়িতা ইহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয় কথা। জয়গোপাল গোস্বামী পরম বৈষ্ণব ও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। তিনি কেন যে একজন "অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়া" কর্ম্মকারের নামে এই গ্রন্থ প্রচার করিবেন তাহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত। গোস্বামী মহাশয় শিশির বাবু ও রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের নিকট ঐ গ্রন্থ নিজেই রচনা করিয়াছেন বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। স্বকপোলকল্পিত খেয়াল কখনও প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না এবং উহা কখনও সত্যকে দুরীভূত করিতে পারে না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "যাহারা বলিয়াছিলেন গোবিন্দ কর্ম্মকার জাতীয় ছিলেন না, তিনি কায়স্থ ছিলেন এবং এইমত প্রচার করিয়া প্রকাশিত গোবিন্দ দাসের কড়চার ৫০ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের যুক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কড়চা আগাগোড়া খাঁটি জিনিষ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় সং ৩৪০ পৃষ্ঠা)।

(৫) এই গ্রন্থের হস্ত লিখিত প্রাচীন পুথি যে পাওয়া যায় নাই তাহা বলা যায় না। ইহাতে, বৈষ্ণব সমাজের শ্রেণী বিশেষের বিষয় না থাকাতে অধিকন্তু বহুদিন হইতেই ইহা গোড়া বৈষ্ণব সমাজের স্নেহ সমাদর না পাওয়ায় অনেক বৈষ্ণব যে ইহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিবেন তাহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে। ঐ সকল বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হেতু ইহার প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির প্রচার করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন নাই। ঐতিহাসিক কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দ দাসের কড়চা একখানি খাঁটী ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আজন্ম তাঁহার কবি মহাপ্রভুর ভ্রমন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। আমরা একখানি খণ্ডিত হস্তলিখিত "কড়চা" পাইয়াছি। ইহার প্রথম হইতে ১২ পাতা এবং শেষের অনেকগুলি পাতা পাওয়া যায় না।" (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৩১৭, ১ম সংখ্যা ১০ পৃষ্ঠা)।

(৬) প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৩০৪ সনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দ দাসের কড়চা নামক যে চৈতন্যজীবনী প্রচলিত আছে তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।"

(৭) বর্ত্তমান বঙ্গে যাহারা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিবার ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। যিনি হিন্দুর অমৃতময় গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতকেও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন সেই রাখাল বাবুও এই ভক্তকবি গোবিন্দদাস রচিত কড়চা গ্রন্থকে বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের (দ্বিতীয় ভাগ) নানাস্থানে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ; তিনি উক্ত গ্রন্থের ৩১৩পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "নবদ্বীপে তাহার (কর্ম্মকার জাতীয় গোবিন্দ দাসের) সহিত চৈতন্য দেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তদবধি তিনি তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন ; গোবিন্দ দক্ষিণাপথে তীর্থ যাত্রাকালে, চৈতন্যের সহচর ছিলেন এবং গোপনে তীর্থযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।"

(৮) বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও গ্রন্থ বৈষ্ণবে রচনা করিলেই যে তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইবে এবং কোনও অ-বৈষ্ণব সেই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিলে (স্বকীয় মনঃপুত না হইলেই) বৈষ্ণব সমাজ তাহা গ্রহণ করিবেন না এইরূপ উক্তি সমীচিন নহে। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "উৎকৃষ্ট শিল্পী কর্ম্মকার বহুমূল্য মণিখচিত স্বর্ণময় দেববিগ্রহ নির্ম্মাণ করিলে যতদূর সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দ কর্ম্মকারের লেখনী নির্ম্মিত চৈতন্য মূর্ত্তি তাহা হইতেও সুন্দর হইয়াছে।" (ব, ভা, ও সা, ৩য় সং ৩২৯ পৃষ্ঠা) তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া, কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া এই কড়চা গ্রন্থখানিকে "চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া" স্বীকার করেন নাই। তিনি উহাতে এমন কতকগুলি আকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন যাহাতে তিনি এবং বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ উহাকে একবাক্যে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী মহাশয় যে লিখিয়াছেন, "দীনেশ বাবু নিজে বৈষ্ণব নহেন * * তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে ভ্রম ও প্রমাদযুক্ত কতকগুলি উক্তি করিয়াছেন," প্রভৃতি কথাগুলি আমাদের নিকট আদৌ বিচারসহ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

শ্রদ্ধেয় নগেন বাবু কড়চা গ্রন্থের অভ্যন্তরের বিবরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও আমাদের দুই চারিটী কথা বলিবার আছে।

(১) মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে কড়চায় যাহা লিখিত আছে তাহার দ্বারা গোঁড়া বৈষ্ণব সমাজের নিকট উক্ত গ্রন্থ অপাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ঐই গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র নাই। সম্প্রদায় বিশেষের সুযোগ সুবিধার জন্য গোবিন্দদাস এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন গোঁড়া বৈষ্ণব হইতে গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর প্রতি কম শ্রদ্ধাবান ছিলেন না।

"কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥
* * *
এক দিন তাহা মধ্যে পঞ্চবটি বনে।

ভিক্ষা হ'তে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥
নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন।
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥
ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজরাশি।
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥
এই ভাব হেরি মোর ধাঁধিল নয়ন।"

প্রভৃতি কড়চায় ভক্ত গোবিন্দের বর্ণনা আমাদের উক্তিই সমর্থন করিবে।

(২) শ্রদ্ধেয় নগেনবাবু মহাপ্রভু সম্বন্ধে কড়চার প্রতিকূলে যে পাঁচ দফা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই চৈতন্য চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া; কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় শত বৎসর পরে অনেকাংশে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। কড়চায় লিখিত:—

"কেন অপরাধী কর আমারে জননী।
এই মাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর॥
সব এলোমেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
গিয়াছে কৌপীন খুলি কোথা' বহির্ব্বাস॥
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হ'তে মাণিক্যের গোছা॥
না খাইয়া অস্থি চর্ম্ম হইয়াছে সার।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥
হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হ'তে অদ্ভুত তেজ বাহিরায়॥

প্রভৃতি বর্ণনা কখনও আধুনিক ভাষা বলিয়া মনে হয় না।

[আগামী বারে সমাপ্য

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার নিয়মাবলী।

১। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষি শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ-সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

২। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন পাঁচশত বা তদূর্দ্ধ পরিমিত অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা সভার আজীবন সদস্য ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ একখানি "সদস্যপদ স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সদস্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া ১৲ টাকা প্রবেশিকা (রঙ্গপুরবাসী উভয় সভার সদস্যের পক্ষে) বা চারি মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা (কেবল শাখা-সভার সদস্যের পক্ষে) সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলে তাঁহাকে সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৪। মূল ও শাখা-পরিষদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ উভয় সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ।৷০ আনা এবং শাখা-পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কেবল শাখা সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ।০ আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। উভয় সভার সদস্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকারসহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন; কেবল শাখা-সভার সদস্যগণ শাখা-সভার যাবতীয় অধিকারসহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখা-সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই থাকিবে।

৫। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্যসেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদস্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোনও না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ।

৬। সদরের সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ষ মধ্য ও শেষভাগে চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দিয়া চাঁদার টাকা গৃহীত হয়। মফঃস্বলের সদস্যদিগের নিকট বর্ষ মধ্য ও শেষভাগে ভি, পি, যোগে পত্রিকাদি পাঠাইয়া চাঁদার টাকা লওয়া হয়। এইরূপে বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি প্রাপ্তির দাবী করিতে পারিবেন না। উভয় সভার সদস্যের দেয় অন্যূন ।৷০ চাঁদার অর্দ্ধাংশ মূল সভা এবং অপরার্দ্ধাংশ শাখা সভা স্ব স্ব পত্রিকাদি উক্ত প্রকারে ভি, পি, যোগে প্রেরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মূল সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মূল সভা এবং শাখাসভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি শাখা সভা স্ব স্ব ব্যয়ে বিতরণ করিবেন।

৭। কেবল রঙ্গপুরবাসীর একত্রে মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। যে সকল সদস্য ১৩২০ সালের পূর্ব্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা রঙ্গপুরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৮। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ।

সভা সম্পর্কীয় টাকা ও বিনিময়পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, রঙ্গপুর। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।